তুমি
সেই
রানী
ড. মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান

ড. মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান

তুমি সেই রানী

অনুবাদ

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

মাকতাবাতুল আখতার
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭১৮৫২৭১০২

চতুর্থ প্রকাশ : আগস্ট ২০০৯ ঈ.
তৃতীয় প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৯ ঈ.
দ্বিতীয় প্রকাশ : মার্চ ২০০৮ ঈ.
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০০৭ ঈ.

তুমি সেই রানী

▫ প্রকাশক : হাফেজ মাওলানা আহমদ আলী
মাকতাবাতুল আখতার

 ▫ প্রচ্ছদ : নাজমুল হায়দার ▫ কম্পোজ :
আস-সালাম কম্পিউটার গ্রাফিক্স সিস্টেম ৪৫ বাংলাবাজার ঢাকা

মূল্য : ১৩০ টাকা মাত্র

ISBN : 984-70136-0008-4

অনুবাদকের কথা

আমাদের একটা সোনালী অতীত আছে। সে অতীত- বড়ো গরবের অতীত। বড়ো পুণ্যময় অতীত। সে অতীতকাল যোজন যোজন দূরে হলেও আমাদের তৃষিত আত্মা বারবার ফিরে যেতে চায় সে সোনালী অতীতে- কল্প-জগতের ডানায় ভর করে হলেও। কেননা, সে অতীতের জন্যে আমাদের দরদ ও মায়া অনেক বেশী। সে অতীতের কোলে ফিরে যেতে আমরা ভীষণ লালায়িত। প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ। কারণ সে অতীতের গর্ভে ছড়িয়ে আছে-

আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি।

শিক্ষা ও দীক্ষা।

চিন্তা ও চেতনা।

ঈমান ও আকিদা।

জিহাদ ও কুরবানী।

অহঙ্কার ও গর্ব।

সেখানে লুকিয়ে আছে আমাদের সবকিছু।

তাই সেখান থেকে সম্পদ না নিলে- আমরা নিঃস্ব।

সেখান থেকে আলো না নিলে- আমরা আলোহীন।

সেখান থেকে শিক্ষা না নিলে- আমরা মূর্খ, বর্বর।

সেখান থেকে দীক্ষা গ্রহণ না করলে- আমরা পরকাল-বিচ্ছিন্ন। আধ্যাত্মিকতা-শূন্য।

সে ইতিহাস আমাদের সবকিছুর উৎস ও কেন্দ্র।

'তুমি সেই রানী'- বইটি মূলত সেই সোনালী ইতিহাসেরই একটি ঝলক ও আলোকিত পরিবেশনা।

এটি আরব বিশ্বের সাড়া জাগানো একটি নারীগ্রন্থ। কিশোরী ও তরুণীদের হৃদয় জয়-করা একটি গল্পগ্রন্থ। এ বইটি সম্পর্কে– আরব-জাহানের পাঠক-পাঠিকাদের পাঠোত্তর অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া একসঙ্গে জমা করলে আলাদা একটি বই হয়ে যাবে। একজনের প্রতিক্রিয়া এমন–

(إنها ملكة) عبارة عن مجموعة من القصص القصيرة، قصص أبطالها من الملكات، ملكات في الإيمان الكامل والأخلاق الراقية ، الكتاب ممتع فعلا وستلاحظون بعد قراءة سطور قليلة منه عدم القدرة على التوقف عن القراءة.

'(إنها ملكة)' বা 'তুমিই নারী' বইটি আসলে ছোট ছোট গল্প সমষ্টি। এমন সব গল্প, যার মূল চরিত্র রানীরা! না। সিংহাসনের রানী না! পরিপূর্ণ ঈমান ও উন্নত চরিত্রের রানী! বইটি আগা-গোড়াই সুখপাঠ্য। কয়েকটা লাইন পড়লে শেষ না করে উঠাই যায় না।'

পাঠক হিসাবে এ বইয়ে বেছে নেয়া হয়েছে প্রধানত কিশোরী ও তরুণীদের। এবং সব নারীদের।

কী আছে এ বইয়ে তাদের জন্যে? ..

ছোট থেকে কীভাবে বড় হতে হয়,

অন্ধকার থেকে কীভাবে আলোতে আসতে হয়,

নারী থেকে কীভাবে রানী হতে হয়,

এ-যুগে বাস করেও কীভাবে ইসলামের পুণ্য যুগের মানুষ হতে হয়– এ-সবই এ-বইয়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

যে সকল রানীদের কথা ও কাহিনী এখানে বলা হয়েছে– তাঁরা কে কে? তাঁরা তো অনেক! বইটি শুরু হয়েছে এক রুশ-কন্যার আঁধার থেকে আলোতে ফেরার বিস্ময়কর ও

মুগ্ধকর এক অসাধারণ কাহিনী নিয়ে। তার পর এসেছে কা'বা গৃহের প্রথম প্রতিবেশিনী হযরত হাজেরার কাহিনী। তারপর এসেছে সর্ব প্রথম ইসলাম কবুল-করা মহিয়সী নারী বিবি খাদিজার কাহিনী। তারপর এসেছে ফেরাউন কন্যার নাম না-জানা কেশবিন্যাশকারিণীর এবং তাঁর পাঁচ সন্তানের অশ্রুময় কাহিনী। এমন আরো অনেক অনে-ক কাহিনী!

তোমাকে বলছি হে কিশোরী ও তরুণী!

যাঁদের কথা বললাম আমি, তুমি হয়তো আগেও পড়েছো তাঁদের কথা ও কাহিনী। কিন্তু আজ পড়বে–

একটু ভিন্নস্বাদে।

ভিন্ন আমেজে।

ভিন্ন পরিবেশনায়।

গল্পের মজা নিয়ে।

উপন্যাসের স্বাদ নিয়ে।

কবিতার শিল্প-সুষমা ও ভাব-প্রাচুর্য নিয়ে।

দেখবে, আজ এ-বই পড়তে গিয়ে তুমি কখনো হাসছো, কখনো কাঁদছো। যদি হাসো, তাহলে বুঝতে হবে– ঈমানের ফুল-ফসলে এবং ইয়াকিনের জোর-প্লাবনে হৃদয় তোমার আবাদই আছে! আর যদি কাঁদো, তাহলে দু' কারণে কাঁদতে পারো– এ-কান্না হয়তো আনন্দের অশ্রুকণা নয়তো অনুশোচনার শিশিরকণা!

প্রিয় বোন!

আর নয়। এখানেই ইতি টানি। আড়াল তুলে নিই। পড়ো এবার– 'তুমিই রানী'। জানো, সত্যিকারের রানী কারা– ভালো করে জানো। তাঁদের মতো হতে তুমিও পণ করো।

তবে যাওয়ার আগে বই লেখার নিয়মিত 'রোজনামচা'টা লিখে যাই।

• বইটি অনুবাদ করতে পেরে আমি খুশি। অনুবাদ কিন্তু বেশ কঠিন কাজ। এ-কঠিন কাজটা করতে গিয়ে শব্দের চেয়ে ভাবকে বেশী প্রাধান্য দিয়েছি। তবে মৌলিকত্ব অক্ষুণ্ন রেখেছি। ভাবের প্লাবনে ভেসে যাই নি। আমার মহান কলম-শিক্ষক এভাবেই আমাকে কলম ধরতে শিখিয়েছেন।

• ভুল! ভুলকে পাশ কাটায় সে সাধ্য ক'জনের আছে? অন্তত আমার নেই। তাই বিনয়ের সাথে স্বীকার করছি- ভুল আছে। কিন্তু আশা এই যে, ভুল দেখে তুমি ক্ষুব্ধ হবে না। ভ্রূ কুঁচকাবে না। যেহেতু তুমি ক্ষমারও রানী।

• 'মাকতাবাতুল আখতার' বইটির প্রকাশক। রুচিশীল পরিচ্ছন্ন ইসলামী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। আমি আন্ত রিকভাবে ধন্যবাদ জানাই তার বড়কর্তাকে, তিনিই জোর করে এতো তাড়াতাড়ি আমাকে দিয়ে বইটি অনুবাদ করিয়ে নিয়েছেন। প্রতিদিনই তার টেলিফোনের আশঙ্কায় থাকতাম- এই বুঝি এলো! এটা তাঁর যোগ্যতা।

ধন্যবাদ আরো অনেক নাম না-বলা সংশ্লিষ্ট বন্ধুকে।

আল্লাহ আমাদের নেক আমল সমূহ কবুল করুন।

বিনীত

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

প্রকাশকের কথা

মনটা এখন খুব আনন্দিত ও প্রফুল্ল। কারণ, 'তুমি সেই রানী' পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরেছি। শোকর তোমার হে আল্লাহ! আবার বলছি– শোকর তোমার হে আল্লাহ! 'তুমি সেই রানী' এ বইটির একটি ছোট্ট (ও মজার) ইতিহাস আছে। একবার ভেবেছিলাম– ইতিহাসটা বুকের ভিতরে চেপেই রাখবো। কিন্তু ছোট্ট হওয়ার পাশাপাশি যেহেতু তা একটু মজারও, তাই মজাটা একা একা না করে সবার মাঝে ভাগ করে দেয়াটাই সমীচীন মনে করলাম।

একদিন কথা হচ্ছিলো স্নেহাস্পদ মাওলানা সাখাওয়াত হোসাইন-এর সাথে। সদ্য আমার প্রকাশনা থেকে 'এ যুগের মেয়ে' নামে তার একটি বই বের হয়েছে। বললাম– ভালো আর কী আছে অনুবাদ করে দিন। তিনি একটি অনাবিল হাসি উপহার দিয়ে বললেন– 'আছে, তবে আপনাকে দেবো না!' আমার বেশ কৌতূহল হলো। বললাম– 'কী আছে?' তখন তিনি বললেন– إما ملكة

আমি বললাম– 'নামটা তো চমৎকার! দেবেন না কেনো?' তিনি বিনয়ের সাথে অপরাগতা পেশ করে জানালেন– 'বইটি আমিই অনুবাদ করবো এবং আমার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'কিশলয়' থেকে ছাপবো।'

আমি মেনে নিলাম। কিন্তু আমার মন মানলো না।

কয়েকদিন পরের কথা। কথা হচ্ছিলো আরেক স্নেহাস্পদ ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী'র সাথে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম– 'আপনার কাছে কি إمـــا ملكـــة আছে?' তিনি প্রথমে হেসে ফেললেন! পরে রহস্য করে বললেন– 'তার

আগে বলুন إنها ملكة -এর খবর আপনার কাছে এলো কী করে?' আমি তাকে সব বললাম। তিনি তখন বললেন- 'হ্যাঁ, আছে।' আমি বললাম- 'দ্রুত অনুবাদ করে দিতে পারবেন আমাকে?' তিনি তখন জানালেন- 'পারা যাবে। কিন্তু...!'

আমি তার কাছে কিন্তু'র ইতিহাসটা জেনে আরো মজা অনুভব করলাম। বললাম- 'সেটা আমি দেখবো। আপনি শুরু করুন।'

তারপর অনুবাদ শুরু হলো। টেলিফোন করে করে বারবার আমি তাড়া দিচ্ছিলাম। অনুবাদক অলসতা করার কোনো সুযোগই পেলেন না।

হ্যাঁ, এভাবেই إنها ملكة এ পর্যন্ত এসেছে। এর উৎস হলেন মাওলানা সাখাওয়াত। অনুবাদক হলেন ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী, আর প্রকাশক হলাম আমি। 'উৎস'কে আন্তরিক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ দিতে চাই প্রিয় অনুবাদককেও। আরব বিশ্বে সাড়া জাগানো এমন একটি কিশোরী ও তরুণী-ঘনিষ্ঠ অতি প্রয়োজনীয় বই-এর অনুবাদ উপহার দেয়ার জন্যে।

প্রতিশ্রুতি রইলো, আগামীতেও মাকতাবাতুল আখতার এ ধরনের আরো বই উপহার দেবে- ইনশাআল্লাহ! মহান আল্লাহ বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের শ্রম কবুল করুন এবং একে দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ ও মুক্তির উসিলা করে দিন। আমীন!

বিনীত
আহমদ আলী

মাকতাবাতুল আখতার
ঢাকা।

সূচিপত্র

পরিশিষ্ট

সূচনা

ও ছিলো এক রাশিয়ান তরুণী। এক রক্ষণশীল পরিবারে ওর জন্ম। খৃষ্টধর্মের 'প্রটেষ্ট্যান্ট' গোষ্ঠীর কট্টর অনুসারী।

একবার এক রুশ বণিক ওকে উপসাগরীয় অঞ্চলের একটি দেশে বাণিজ্য-সফরে তার সাথে যাওয়ার প্রস্তাব দিলো। সাথে থাকবে আরো অনেক রুশ তরুণী। উদ্দেশ্য হলো সেখান থেকে কিছু বৈদ্যুতিক পণ্যসামগ্রী কিনে এনে রাশিয়ার বাজারে বিক্রি করা। তরুণীটি এ প্রস্তাবে দেশ ভ্রমণের আনন্দ ছাড়া খারাপ কিছু পেলো না। তাই সে রাজি হয়ে গেলো। অন্যান্য তরুণীদের সাথে একদিন সে রওয়ানাও হয়ে গেলো।

কিন্তু 'বাণিজ্য-কাফেলা' সেখানে পৌঁছার পরই ঐ 'বণিক-নেতা'র স্বরূপ উন্মোচিত হলো। দাঁত বের করে সে আসল পরিচয়ে সামনে এলো। সাথে নিয়ে আসা তরুণীদেরকে সে দেহপসারিণী হওয়ার প্রস্তাব দিলো। সাথে একঝাঁক লোভনীয় রঙিন প্রস্তাবও দিলো। গাড়ি-বাড়ি ও বিশাল অর্থ-সম্পদের মালিক হওয়ার রূপালী স্বপ্ন দেখালো। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সদর্প পদচারণার সবুজ ইঙ্গিত দিলো। তার এ লোভনীয় প্রস্তাবে অধিকাংশ তরুণী রাজিও হয়ে গেলো।

কিন্তু নিজ ধর্মের প্রতি অতিশয় আসক্ত কট্টর তরুণীটি এ প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলো।

'বণিক' লোকটি তরুণীর এ প্রত্যাখ্যানে রাগ করলো না। তার দিকে তাকালো সরু চোখে। হাসলো অশুভ হাসি। বিদ্রূপের হাসি। তারপর বললো :

'দেখো মেয়ে! এখন এখানে তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো দাম নেই। এখানে তুমি মূল্যহীন। পরনের কাপড় ছাড়া কী আছে তোমার? আমার প্রস্তাবে রাজি হওয়া ছাড়া কোনো পথ তোমার সামনে খোলা নেই।'

এভাবে লোকটি ভীষণ চাপাচাপি শুরু করলো তরুণীটির উপর। ওর থাকার ব্যবস্থা করা হলো অন্যান্য তরুণীদের সাথেই- একটি নির্জন ফ্ল্যাটে। সবার পাসপোর্ট 'ছিনিয়ে' নিয়ে গেলো ঐ ধূর্ত লোকটা।

দেখতে দেখতেই সবাই দেহ-ব্যবসার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলো- রঙিন স্বপ্নের ফানুস উড়িয়ে অজানা আকাশে। ব্যতিক্রম শুধু ঐ তরুণীটি। নিজের মান-ইজ্জত ও সতীত্বকে নিরাপদ রাখার সংগ্রামে অনড় থাকলো ও একাই। ও পাসপোর্ট ফেরত চাইলো। কিংবা ওকে রাশিয়ার পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে বললো। কিন্তু লোকটা অস্বীকার করছিলো। বলছিলো- 'তোমাকে এখানেই থাকতে হবে এবং আমার শর্তও মানতে হবে।'

তারপরও তরুণীটি নিরাশ হলো না। সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলো। একদিন সুযোগ এসেও গেলো। অন্য সব মেয়েরা 'বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে' বাইরে চলে গেলো। ও একা। সুযোগই বটে। পাসপোর্টটা উদ্ধারের জন্যে সারাটা ফ্ল্যাট তন্নতন্ন করে খোঁজাখুঁজি করলো। নিরাশ হতে হতে শেষে তা পেয়েও গেলো। দেহে ও মনে শক্তি সঞ্চয় করে তারপর সে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলো। ধরা পড়ার আশঙ্কা কম। এখন বিশেষ কেউ নেই। এখানে থাকার কোনো অর্থ হয় না। তাই কিছুটা ঝুঁকি নিয়েই সে বেরিয়ে পড়লো সংগোপনে, সন্তর্পণে। দ্রুতপদে ও রাস্তায় এসে উঠলো। সাথে কিছুই নেই- পরনের কাপড়টুকু ছাড়া। বুকটা দুরুদুরু কাঁপছে। কিছুক্ষণ ও নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলো। বুঝতে পারছে না- কোথায় যাবে, কী করবে?

এখানে নেই পরিবার-পরিজন!

নেই কারো সাথে জানাশোনা!

নেই অর্থকড়ি!

নেই ক্ষুধায় অন্ন!

নেই মাথা গুজার ঠাঁই!

কিছুই নেই! শুধু নেই, নেই আর নেই!

কিন্তু এ সব 'নেই'-এর ভিতরে দাঁড়িয়েও ও প্রশান্ত। কেননা সতীত্ব রক্ষার সংগ্রামে ও প্রাথমিকভাবে বিজয় লাভ করেছে। পূর্ণ বিজয় যে আসবেই– সে ব্যাপারে ও ছিলো আস্থাশীল। নৈতিক শক্তির প্রচণ্ডতা যার যতো বেশী সে ততো প্রশান্ত। ঝড়ের কবলেও প্রশান্ত। এখন তার জীবনে কি ঝড় চলছে না? তবুও সে প্রশান্ত। কারণ কিছু মানুষ-নামের জানোয়ার থেকে সে নিজের নারীত্বকে রক্ষা করতে পেরেছে। সামনেও হয়তো আরো ঝড় আছে। সে ঝড় পারবে কি ওকে কাবু করতে?

তরুণীটি অস্থিরচিত্তে .. উদ্বেগমাখা চোখে এদিক-ওদিক দেখতে লাগলো। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়লো এক যুবকের উপর। সাথে তিনজন মহিলা। কালো আবরণে আবৃত। সম্ভবত এরা তার মা-বোন হবে। এদের সঙ্গে নিয়ে কোথাও যাচ্ছে যুবকটি। তার মনে হলো– নির্ভর করার মতো মানুষ। তাই সে ধীরপায়ে তার দিকে এগিয়ে গেলো।

কাছে গিয়ে তাদেরকে রাশিয়ান ভাষায় কিছু বলতে চাইলে যুবকটি জানালো যে, সে তার ভাষা বুঝতে পারছে না। তখন তরুণীটি বললো ঃ

'ইংরেজী জানেন?'

সবাই সম্মতিসূচক মাথা নাড়লো ঃ

'হ্যাঁ, ইংরেজী আমরা জানি!'

মেয়েটি তখন আনন্দে কেঁদে ফেললো! বললো ঃ

'আমি এক অসহায় প্রবাসিনী। আমার বাড়ি রাশিয়া।' তারপর সে কাঁদতে কাঁদতে এ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া সবকিছু সংক্ষেপে তাদেরকে বললো। শেষে বললো বিনয় ঝরিয়ে, মানবতার দোহাই দিয়ে ঃ

'এখন আমি দেশে ফিরে যেতে চাই। কিন্তু আমি এখন নিঃস্ব! নেই টাকা-পয়সা। নেই ঠিকানা। নেই একটু থাকার জায়গা। আমি আপনাদের কাছে

কিছুই চাই না। আমাকে শুধু একটু আশ্রয় দিন। দু'দিন উর্ধে তিনদিন। এর মধ্যেই আমি আমার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করে একটা উপায় বের করে নেবো!'

যে চারজনের কাছে তরুণীটি আশ্রয় প্রার্থনা করলো তারা মা-ভাই-বোন। যুবকটির নাম খালেদ। তরুণীর অশ্রুভরা মিনতি ভীষণ স্পর্শ করলো খালেদকে। ওর চোখের পাতা ভিজে এলো। ভাবলো– ও এক রুশ-ললনা না হয়ে যদি আমার বোন হতো, তাহলে আমি কী করতাম? কিন্তু আবেগে ভেসে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি ছিলো না। তাই খালেদ সহসাই ওকে বাড়ি নিয়ে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করলো না। ভাবলো– যদি সে প্রতারিণী হয়! একটু নীরব থেকে মা ও বোনদের সাথে পরামর্শ করলো। তখন মেয়েটি তাকিয়েছিলো মিনতিভরা চোখে– খালেদের দিকে। চোখে বাঁধভাঙা অশ্রু। সবাই বাসায় নিয়ে যাওয়ার পক্ষেই মত দিলো এবং ওকে নিয়ে বাসার পথে রওয়ানা দিলো।

একটু আগের মিনতিভরা চোখে এখন কৃতজ্ঞতার ছায়া। আশ্রয় পাওয়া মানুষের কৃতজ্ঞতা-নির্ঝর চাহনি, যা সতীত্ব রক্ষার মহিমায় ভাস্বর।

'বাসায়' এসে তরুণীটি রাশিয়ায় নিজের পরিবারের সাথে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করলো। বারবার। অনেকবার। কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না। হয়তো টেলিফোন 'লাইন' খারাপ। তারপরও সে যোগাযোগের চেষ্টা অব্যাহত রাখলো।

এর মধ্যেই খালেদের পরিবার জানতে পারলো– তরুণীটি খৃষ্টান। অবশ্য এতে ব্যবহারে কোনো তারতম্য হলো না। বরং 'বিজাতীয় অতিথি' হিসাবে ওর সাথে তাদের ব্যবহার ছিলো আরো সৌজন্যমূলক ও কোমল। বোনেরা ওকে নিজেদের গল্প-সঙ্গিনী বানিয়ে নিলো। তরুণীটিও সবাইকে পছন্দ করলো। ভালোবাসলো। সবার নিবিড় সখ্যতায় মুগ্ধ হলো। পরের বাড়িকেই নিজের বাড়ি বলে বারবার ভুল হতে লাগলো।

মুসলমানদের কাজ হলো ইসলামের দিকে মানুষকে ডাকা। খালেদের পরিবারও তরুণীটিকে ইসলামের দিকে ডাকলো। কিন্তু ও সাড়া দিলো না। 'না' বলে দিলো। বরং ও ধর্ম নিয়ে কোনো বিতর্কেই জড়াতে চাইলো না। কেননা ও ছিলো মনে প্রাণে এক কট্টরপন্থী খৃষ্টান। ধর্ম বদল ওর জন্যে

তাই কঠিন, 'অকল্পনীয়'। কিন্তু খালেদের পরিবার আশা ছাড়লো না। খালেদ ছুটে গেলো স্থানীয় 'ইসলামী দাওয়াত সংস্থা'র অফিসে। সেখান থেকে নিয়ে এলো রুশ ভাষায় লিখিত ইসলাম সম্পর্কে বেশ কিছু বই-পত্র। এনে মেয়েটিকে পড়তে দিলো। এবার মেয়েটি 'না' বলতে পারলো না। বরং পড়তে শুরু করলো। পড়তে পড়তে দেখলো– খারাপ লাগছে না। ধীরে ধীরে ইসলামের প্রতি তার কৌতূহল বাড়তে লাগলো। ও প্রভাবিত হতে লাগলো।

এভাবে গড়াতে লাগলো সময়। সাথে সাথে চলতে লাগলো পরিবারের পক্ষ থেকে– চেষ্টা সাধনা কৌশল, সর্বোপরি দু'আ। অবশেষে তরুণী'র দিল পরিষ্কার হয়ে গেলো। ও ইসলাম কবুল করে ধন্য হলো!

ইসলামই এখন তার ভালোবাসা।

ইসলামই এখন তার অনুরাগ।

ইসলামই এখন তার ধ্যান-জ্ঞান-সাধনা।

আমূল বদলে গেলো তার জীবনধারা।

চিন্তাধারা।

ঈদ শেখায় এখন সে আত্মনিবেদিতা।

পুণ্যবতী নারী-সংস্রব এখন তার কাছে লোভনীয়।

দেশে ফেরা? না, একদম মনে চায় না।

দেশে গেলে মা-বাবা জোর করে আবার ওকে খৃষ্টধর্মে ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা চালাতে পারেন। কে চায় আলো থেকে আঁধারে যেতে? কিন্তু এ অবস্থায় আরেকজনের বাসায়ই বা ক'দিন থাকা যায়? .. তার চেহারায় দুশ্চিন্তা-রেখা ফুটে উঠলো। এ দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো পথ কি তার সামনে খোলা আছে? জানে না, ও কিছুই জানে না।

বিবাহ

সবচে' প্রশস্ত পথটাই অবশেষে তার সামনে খুলে গেলো! আর সেই খোলা পথেই এখন ওর জীবনের চাকা ঘুরতে লাগলো! কিছুদিন পর খালেদের সাথে বিবাহ হয়ে গেলো! সকল দুশ্চিন্তার অবসান হলো। এমন স্ত্রী পেয়ে

খালেদ যেমন খুশি, অকূল দরিয়ায় তীর পাওয়ার মতো এমন স্বামী পেয়ে মেয়েটি আরো বেশী খুশি। খুশি যোগ (+) খুশি, সমান সমান (=)– সৌভাগ্য ও আনন্দ এবং সুখ ও তৃপ্তি!! জীবনের অঙ্ক– এতো চমৎকার করে সহজে মিলে না। মিলে তখনই, যখন থাকে কুদরতের ইশারা। এখানেও ছিলো সেই আসমানী ইশারা। সতীত্ব ও সম্মানকে যারা সংরক্ষণ করতে সংকল্পবদ্ধ হয়, কুদরতের সহযোগিতা তাদের ন্যায্য পাওনা। নইলে যে রূপ তরুণীর হওয়ার কথা ছিলো দেহপসারিণী, সে কেনো হবে ইসলাম 'প্রচারিণী'!!

•

এই হিজাব না সেই হিজাব

একবার স্বামী খালেদের সাথে ও এক বিপণী কেন্দ্রে বের হলো। সেখানে ও এক হিজাবপরা মহিলাকে দেখতে পেলো, যার চেহারা সম্পূর্ণ আবৃত। এই প্রথম সে কোনো পূর্ণ হিজাপরা মহিলাকে দেখলো। তাই (হিজাবের) এই অচেনা আকৃতি দেখে ভীষণ অবাক হলো ও। বললো–

'খালেদ! এ ভদ্র মহিলা এমন করে সারা মুখ ঢেকে রেখেছেন কেনো? তার চেহারা কি তবে 'এসিড দগ্ধ' যা প্রকাশ করতে তিনি লজ্জা পাচ্ছেন?'

খালেদ বললো–

'না! ইনি আসলে হিজাব পরেছেন। এ হিজাবই প্রকৃত হিজাব। এমন হিজাবেরই নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে স্ত্রী বললো–

'হ্যাঁ, আমার কাছে ব্যাপারটা আগে স্পষ্ট ছিলো না। আমিও মনে করি সত্যিকারের ইসলামী হিজাব এমনই হওয়া উচিত। এমন হিজাবই আল্লাহ চান আমাদের কাছে।'

খালেদ বললো–

'কিন্তু কী করে বুঝলে তুমি?'

'শোনো! আমি এখানে আসার পর যে বিপণী বিতানেই প্রবেশ করেছি,

দেখতে পেয়েছি একদল মানুষ আমার চেহারার দিকে হা করে তাকিয়ে আছে। দৃষ্টি নামাচ্ছে না। যেনো ওরা আমার চেহারাকে গোগ্রাসে গিলছে। টুকরো টুকরো করে খাচ্ছে। সুতরাং বোঝা গেলো– আমার চেহারা ঢেকে রাখতে হবে। স্বামী ও নিকটাত্মীয় ছাড়া আর কেউই আমার মুখাবয়ব দেখতে পারবে না। আজ হতে আমি পূর্ণ ইসলামী হিজাব না পরে আর কোনো বিপণী কেন্দ্রে যাবো না। বাইরেও বের হবো না। বলো তো, কোথায় পাওয়া যায় এই হিজাব?'

খালেদ বললো–

'তুমি বরং আমার মা-বোনের মতো মুখ-খোলা হিজাবই পরো!'

স্ত্রী বললো–

'না! তা হয় না! আমি মুসলমান। পূর্ণ মুসলমান। তাহলে আমার হিজাব কেনো হবে 'অমুসলমান', অপূর্ণ?! সে হিজাবই পরতে চাই আমি, যা পছন্দ করেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।'

এভাবেই সময় গড়িয়ে যায়। তরুণী'র ঈমান-আমলও দিনদিন বাড়তে থাকে। খালেদের পক্ষ থেকে ওর প্রতি দয়া ও দরদের এবং প্রেম ও ভালোবাসার কোনো অভাব ছিলো না। স্ত্রীও খালেদের মনের গভীরে ঠিকানা গড়ে তোলে– আনুগত্য ও ভালোবাসার পাপড়ি ছড়িয়ে ছড়িয়ে। স্বামীর সরব ও নীরব অনুভূতির সাথে কথা বলে বলে। খালেদের পরিবার ভীষণ খুশি। তারা ভাবে– 'সেদিন কি আমরা রাস্তায় কোনো 'রুশ তরুণী' আবিস্কার করেছিলাম না পেয়েছিলাম জীবন্ত কোনো হীরা?'

বেশ কিছুদিন পরের কথা। তরুণীটি নিজের পাসপোর্ট বের করে দেখলো– মেয়াদ প্রায় শেষের দিকে। অতিসত্তর নতুন পাসপোর্ট করতে হবে। শুধু তাই নয়, রাশিয়ায় গিয়ে তার নিজের শহর থেকে তা করে আনতে হবে। সুতরাং রাশিয়া যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। নইলে এখানে তার বসবাস অবৈধ বলে গণ্য হবে। খালেদও তার সাথে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। কেননা মাহরাম ব্যতিত মহিলাদের একাকী সফর করা বা দূরে কোথাও যাওয়া জায়েয নেই।

রাশিয়ান এ্যারলাইন্সের একটি বিমানে তারা চেপে বসলো। পরিপূর্ণ ইসলামী হিজাবে আবৃত হয়েই সে বিমানে আরোহণ করলো। স্বামীর পাশে

বসে আছে সে গর্ব নিয়ে, অহঙ্কার নিয়ে। পর্দা তো এখন তার গর্বই!

খালেদ তার কানে কানে বললো—

'তোমার পর্দার কারণে আমরা এখানে সমস্যায় পড়তে পারি।'

'যা হয় হোক। আমি আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করতে পারি না। কারো ইচ্ছে-অনিচ্ছের তোয়াক্কা করতে পারি না।'

খালেদের আশঙ্কাই সত্য হলো। 'বেঈমান' যাত্রীরা বাঁকা চোখে ওর স্ত্রীর দিকে তাকাতে লাগলো। বিমানবালারা খাবার পরিবেশন করলো। খাবারের সাথে মদও। মদ খেয়ে মদ্যপরা মাতলামি শুরু করে দিলো। বিভিন্ন কটূক্তি এদিক-ওদিক থেকে তার দিকে নিক্ষিপ্ত হতে লাগলো। কেউ কৌতুক করছিলো। কেউ মুখ টিপে হাসছিলো। কেউ ঠাট্টা-বিদ্রূপের আগুনে ফু দিচ্ছিলো। কেউ চলতে চলতে তার পাশে এসে একটু থমকে দাঁড়াচ্ছিলো। মন্তব্য ছুঁড়ে দিচ্ছিলো। খালেদ নির্বাক তাকিয়ে তাকিয়ে সবই দেখছিলো কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছিলো না। সবই বলা হচ্ছিলো রুশ ভাষায়। সে মনে মনে ক্ষুব্ধ হচ্ছিলো, ফুঁসছিলো। পক্ষান্তরে তার স্ত্রী মৃদু মৃদু হাসছিলো। ওদের কিছু কিছু কথা ও খালেদকে তরজমা করেও শুনালো। তরজমা শুনে খালেদের রক্তে আগুন জ্বলে উঠলো। কিন্তু স্ত্রী তাকে শান্ত থাকতে বললো। আর বললো—

'সাহাবায়ে কেরাম দ্বীনের জন্যে যে মেহনত-মুজাহাদা করেছেন এবং যে জুলুম-নিপীড়ন সয়েছেন, সে তুলনায় আমরা আর কী করছি, কী সইছি?'

স্বামী-স্ত্রী ধৈর্য ধরলো। ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলো। এক সময় বিমান তাদের গন্তব্যে পৌঁছে গেলো।

রাশিয়ায়

এর পরের ঘটনাবলী শুনবো আমরা খালেদের কাছে—

'বিমানবন্দরে নামার পর আমার ধারণা ছিলো আমরা তার মা-বাবার কাছেই গিয়ে উঠবো এবং সেখানেই অবস্থান করবো। এর মাঝে পাসপোর্ট নবায়নের কাজকর্ম সেরে ফিরে যাবো। কিন্তু আমার স্ত্রী ভাবছিলো অন্য কিছু। ও আমাকে বললো—

'আমার পরিবার গোড়া খৃষ্টান। ধর্ম পালনে ভীষণ কট্টর তারা। তাই ওখানে আপাততঃ যাওয়া ঠিক হবে না। আমরা বরং একটা বাসা ভাড়া নিয়ে সেখান থেকেই কাজ-কর্ম শেষ করবো। ফিরে যাওয়ার আগে তাদের সাথে দেখা করে খোঁজ-খবর নিয়ে যাবো।'

আমি দেখলাম– ওর চিন্তা যথার্থ ও সঠিক। সুতরাং আমরা একটি ছোট্ট বাসা ভাড়া করে সেখানে গিয়েই উঠলাম।

পরদিন গেলাম পাসপোর্ট অফিসে। অফিসারের নিকট গিয়ে আমাদের আবেদন পেশ করলাম। তিনি পুরোনো পাসপোর্ট দিতে বললেন এবং সদ্য তোলা রঙিন ছবি চাইলেন। আমি তখন আমার স্ত্রীর কয়েকটি সাদাকালো ছবি বের করে দিলাম। সর্বাঙ্গ হিজাব-ঢাকা। শুধু চেহারার গোলাকৃতিটুকু অনাবৃত। অফিসারটি এ-সব দেখে বললেন–

'এ ছবি চলবে না। রঙিন ছবি দিতে হবে। চেহারা, চুল ও কাঁধ খোলা রাখতে হবে।'

কিন্তু আমার স্ত্রী এ সাদাকালো ছবি ছাড়া অন্য ছবি দিতে অস্বীকার করলো।

আমরা প্রথম অফিসারের কাছে ব্যর্থ হয়ে গেলাম একে একে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অফিসারের কাছে। কিন্তু কোনো কাজ হলো না। সবাই অনাবৃত রঙিন ছবি চাইলো। এ অবস্থায় আমার স্ত্রী বললো–

'আমি কোনো অবস্থাতেই অনাবৃত রঙিন ছবি দেবো না!'

তখন অফিসার আবেদন মঞ্জুর করতে এবং পাসপোর্ট নবায়ন করতে অস্বীকৃতি জানালো।

ফলে আমরা শরণাপন্ন হলাম বিভাগীয় প্রধানের কাছে। তিনি ছিলেন একজন মহিলা। আমার স্ত্রী তাকে অনুরোধ করলো এ ছবিগুলোই গ্রহণ করতে। কিন্তু তিনিও মুখের উপর 'না!' বলে দিলেন। কিন্তু আমার স্ত্রী হাল ছাড়লো না। তাকে বোঝানোর অনেক চেষ্টা করলো। বললো–

'আপনি কি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না? যে ছবিগুলো আপনাকে দিলাম তার সাথে আমাকে একটু ভালো করে মিলিয়ে দেখুন না! চেহারাই তো আসল! চুল এক সময় বদলে যায়। সুতরাং আমি মনে করি আমার এ

ছবিগুলোই যথেষ্ট। অনাবৃত রঙিন ছবির কোনো প্রয়োজন নেই।'

পরিচালিকা তবুও 'না'-ই করলেন। বললেন–

'প্রশাসন এটা অনুমোদন করবে না। আমাদের কিছুই করার নেই।'

আমার স্ত্রী বললো–

'আমি এ ছবি ছাড়া অন্য ছবি দেবো না। এখন বলুন সমাধান কী!'

পরিচালিকা বললেন–

'এ সমস্যার সমাধান এখানে আমার কাছে নেই। এর সমাধান দিতে পারবেন শুধু মস্কোর প্রধান পাসপোর্ট অফিসের মহা পরিচালক। আপনি ইচ্ছে করলে সেখানে গিয়ে চেষ্টা করতে পারেন।'

আমরা পাসপোর্ট অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম। আমার স্ত্রী আমার দিকে তাকিয়ে বললো–

'খালেদ! আমাদেরকে এখন মস্কো যেতে হবে!'

আমি বললাম–

'মস্কো গিয়ে কাজ নেই। তুমি বরং হিজাববিহীন রঙিন ছবিই ওদেরকে দিয়ে দাও। আল্লাহ্ সাধ্যাতীত কোনো কিছু মানুষকে চাপিয়ে দেন না। তাই আল্লাহকে ভয় করো– যতোটুকু পারো– সাধ্যের ভিতরে। এটা তো একটা প্রয়োজন। তা ছাড়া তোমার পাসপোর্ট তো আর সবাই দেখছে না। কেবল নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি ছাড়া। তাও প্রয়োজনের খাতিরে। তারপর তুমি নিজের পাসপোর্ট নিজের কাছেই রেখে দেবে। মেয়াদ শেষ না পর্যন্ত কেউই আর তা দেখতে চাইবে না। সুতরাং তুমি ব্যাপারটাকে সহজভাবে নাও। তাহলে মস্কো যাওয়া ছাড়াই কাজ হয়ে যাবে।'

কিন্তু ও নিজের সিদ্ধান্তে অনড়–

'না! হিজাববিহীন ছবি দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। কারণ এখন আমি দ্বীনের মর্যাদা বুঝি। পর্দার মাহাত্ম্য বুঝি। পর্দা আল্লাহ্র হুকুম। একদল 'বেঈমান'-এর জন্যে আমি আমার রব-এর হুকুম অমান্য করতে পারি না। কক্ষনো করবো না! ফল যা হয় হোক!'

মস্কোতে

আমার স্ত্রী তার সিদ্ধান্তে অটল অবিচল। ও মস্কো যাবেই। অগত্যা আমিও রাজি হলাম। প্রথম অভিযানে ব্যর্থ হয়ে আমার মনটা খুব খারাপ। জানি না, দ্বিতীয় অভিযানটা আরো শক্ত ও কঠিন হবে কি না। মস্কো পৌঁছে আমরা একটা ঘর ভাড়া নিলাম। সেখানেই রাতটা কাটালাম।

পরদিন দুরুদুরু মনে গিয়ে হাজির হলাম মস্কো পাসপোর্ট অফিসে। কিন্তু এখানেও অবস্থা তথৈবচ। প্রথম যে অফিসারের কাছে আমরা গেলাম, তিনি 'না' বলে দিলেন। এই 'না' শুনতে হলো দ্বিতীয় ও তৃতীয় অফিসারের কাছেও। অবশেষে এই 'না', 'না' আর 'না'-এর বুকভরা বেদনা নিয়ে হাজির হলাম বরং হতে বাধ্য হলাম 'বড়কর্তা'-এর কাছে। কিন্তু 'বড়কর্তা'টি ছিলেন আরো বেশী 'খবিস'। তিনি পাসপোর্ট হাতে নিয়ে আগের সংযুক্ত ছবিটা উল্টেপাল্টে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখে বললেন–

'প্রমাণ কী যে, আপনিই এ ছবির বাহক?'

অর্থাৎ তিনি অবগুণ্ঠন সরাতে বললেন এবং আমার স্ত্রীর চেহারা দেখতে চাইলেন। আমার স্ত্রী বললো–

'আমি কোনো পুরুষের সামনে আমার অবগুণ্ঠন খুলবো না। তবে এখানে কোনো মহিলা অফিসার বা মহিলা সেক্রেটারী থাকলে সে আমার চেহারা এ-ছবির সাথে মিলিয়ে দেখতে পারে।'

এ কথায় 'বড়কর্তা' ভীষণ ক্ষুণ্ন হলেন। চটে গেলেন। পুরোনো পাসপোর্টটি, ছবিগুলো এবং অন্যান্য কাগজ-পত্র এক সাথে জমা করে তার 'বিশেষ ড্রয়ারে' রেখে দিয়ে বললেন–

'আমাদের শর্ত মুতাবেক ছবি না নিয়ে এলে আপনি পুরোনো পাসপোর্টও পাবেন না, নতুন পাসপোর্টও পাবেন না!'

আমার স্ত্রী তাকে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করছিলো। বিভিন্ন উপায়ে, বিভিন্ন যুক্তিতে। তারা কথা বলছিলো আমার অজানা– রুশভাষায়। তাই নীরবে শোনা এবং দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আমার কিছুই করার ছিলো না। তবে আমার শরীরে বার বার 'ক্ষোভ-রক্ত-কণিকারা' জ্বলে জ্বলে উঠছিলো! মনে মনে বলছিলাম– 'কী দুষ্ট এই বেঈমান লাল রুশরা! এটা কি আইনের প্রতি নিষ্ঠা না ইসলাম বিদ্বেষ?'

আমার স্ত্রী অনেক চেষ্টা করলেন তাকে বোঝানোর। কিন্তু তিনি বুঝলেন না। আমার স্ত্রীর কোনো যুক্তিই তিনি শুনলেন না। তিনি বারবার এক কথাই বলছেন–

'ছবি দিতে হবে আমাদের শর্ত অনুযায়ী!'

আমি কাতর চোখে আমার স্ত্রীর দিকে তাকালাম। বললাম–

'দেখো, এখানে তুমি অসহায়। কিছুই করার নেই তোমার। পর্দা রক্ষার জন্যে অনেক চেষ্টাই তো তুমি এতোক্ষণ করলে, কিন্তু কোনো ফল হলো না। তোমার চেষ্টা তুমি করেছো। যতোটুকু তোমার সাধ্যে কুলায়। এখন বাকিটুকু আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। ওদের শর্ত মেনে নাও। নইলে কতো আর আমরা ছুটোছুটি করবো– লোকে লোকে, দ্বারে দ্বারে?'

স্ত্রী আমার তখন বললো–

> وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.
>
> 'যে ভয় করে আল্লাহকে, তার জন্যে আল্লাহ মুক্তির পথ বের করেই দেন! এবং তাকে রিযিক দান করেন এমন জায়গা থেকে যা সে কল্পনাও করে না।'

এভাবে আমার এবং তার মাঝে কথা হচ্ছিলো। মাঝে মাঝে আমাদের কথা– কথা-কাটাকাটি ও বিতর্কের পর্যায়েও চলে যাচ্ছিলো। এতে বড়কর্তা 'রাগ করে' আমাদেরকে তার অফিস থেকে তাড়িয়ে দিলেন!

আমরা তাড়া খেয়ে বের হয়ে এলাম। আমার স্ত্রীর প্রতি আমার দয়াও হচ্ছিলো আবার ক্ষোভও সৃষ্টি হচ্ছিলো। বাসায় ফিরে আমরা বিষয়টা পর্যালোচনা করলাম। আমার স্ত্রী আমাকে নিজের মতের পক্ষে যুক্তি পেশ করছিলো আর আমি আমার মতের পক্ষে যুক্তি পেশ করছিলাম। ও চাইলো আমাকে বোঝাতে আমি চাইলাম ওকে বোঝাতে। এভাবেই রাত নেমে এলো। দু'জনে ইশা পড়লাম।

উদ্ভূত সঙ্কটে আমার মনটা ছিলো ভীষণ ভার। নামাজের পর কোনো রকম

রাতের খাবারটা খেয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম– ঘুমাতে। ঘুম কি আসবে?

কীভাবে তুমি ঘুমোচ্ছো?

আমাকে অমন নিস্তেজ ভঙিতে শুয়ে থাকতে দেখে আমার স্ত্রীর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। আমার দিকে সরু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো–

'খালেদ! তুমি ঘুমোচ্ছো!'

আমি বললাম–

'হ্যাঁ, তুমি কি ক্লান্তি অনুভব করছো না? ঘুমাবে না?'

ও অবাক হয়ে বললো–

'হায় আল্লাহ! এ সঙ্গিন পরিস্থিতিতে কী করে ঘুম আসে? এখন ঘুমানোর সময় না খালেদ– আল্লাহর কাছে আশ্রয় ও সাহায্য চাওয়ার সময়! উঠো! আল্লাহর সাহায্য চাও। দু'আ করো।'

আমার স্ত্রীর কণ্ঠে কী ছিলো জানি না। আমি আর শুয়ে থাকতে পারলাম না। দ্রুত উঠে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলাম। অনেকক্ষণ আমি নামাজ পড়লাম। দু'আ করলাম। আল্লাহর নুসরাত ও সাহায্য চাইলাম। এরপর আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না, আবার আশ্রয় নিলাম বিছানায়। কিন্তু আমার স্ত্রী! ও একটুও ঘুমালো না। সারাটা রাত ইবাদতে ইবাদতে আর দু'আয় দু'আয় কাটিয়ে দিলো। যখনই আমার ঘুম ভেঙেছে দেখেছি– কখনো ওকে সিজদায়,

কখনো রুকুতে,

কখনো দাঁড়ানো,

কখনো মুনাজাতরত,

কখনো কান্নারত!

একেবারে ফজর পর্যন্ত!!

ফজরে ও আমাকে ঘুম থেকে জাগালো। বললো–

'উঠো! ফজরের সময় হয়ে গেছে।'

আমি উঠে ওজু করলাম। ফজর পড়লাম। ফজরের পর ও একটু ঘুমালো খুব অল্প সময়। সূর্যালোক ছড়িয়ে পড়তেই ও উঠে গেলো। বললো–

'চলো! আমাদেরকে তাড়াতাড়ি পাসপোর্ট অফিসে যেতে হবে।'

আমি বললাম–

'কী! পাসপোর্ট অফিসে! কিন্তু কী নিয়ে যাবো? কোন্ যুক্তিতে আবার তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াবো? কোথায় নতুন ছবি? কোনো ছবিই তো এখন আমাদের কাছে নেই!'

ও তখন বেশ আস্থার সাথে বললো–

'আমরা যাবো। চেষ্টা চালিয়ে যাওয়াই আমাদের কাজ! মঞ্জুর করবেন আল্লাহ। তাঁর রহমত ও দয়া থেকে নিরাশ কেনো হবো?!'

অবশেষে আমরা গেলাম।

আল্লাহ্‌র কী শান! আমরা অফিসে ঢুকতেই আমার স্ত্রীর 'পরিচিত' আকার-আকৃতি দেখে এক অফিসার ডেকে উঠলেন–

'অমুক মহিলা কোথায়?'

আমার স্ত্রী বললো–

'এই তো আমি এখানেই!'

লোকটি বললো–

'এই নিন আপনার পাসপোর্ট।'

হাতে নিয়ে দেখলাম– নতুন!!

সদ্য সবকিছু পূরণ করা!!

শুরুতেই শোভা পাচ্ছে– তার ছবি!

হিজাবময় ছবি!!

আমার স্ত্রী ভীষণ খুশি! আমার দিকে তাকিয়ে বললো–

'আমি কি তোমাকে বলি নি–

'যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার মুক্তির পথ বের করেই দেন!!'

আমরা বের হতে যাচ্ছিলাম। তখন অফিসারটি বললেন–

'আপনারা এবার ফিরে যেতে পারেন সে শহরে যেখান থেকে এসেছিলেন। সেখানে স্থানীয় অফিস থেকে সিল লাগিয়ে নেবেন।'

আমরা ফিরে এলাম প্রথম শহরে। যেখান থেকে শুরু হয়েছিলো আমাদের এ অভিযানের প্রথম পর্ব। আমার স্ত্রীর পরিবার যেখানে বাস করে, সে শহরে। আমি মনে মনে ভাবছিলাম– এবার কাজ শেষ করে ওর পরিবারের সাথে দেখা-সাক্ষাতের পালা। আমরা আবার একটি ছোট্ট ঘর ভাড়া করে সেখানে গিয়ে উঠলাম। পরদিন স্থানীয় অফিস থেকে অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করলাম।

আল-হামদুলিল্লাহ! এবার আর কোনো সমস্যা হয় নি। সবাই বেশ 'সমীহের দৃষ্টিতে' আমাদের দিকে তাকাতে বাধ্য হলো। মস্কো অফিস জয় করে-আসা অভিযাত্রী দলের এটাই তো ন্যায্য পাওনা!

স্নেহের বাগিচায় নিষ্ঠুরতার ফুল।

এরপর আমরা গেলাম আমার স্ত্রীর পরিবার-পরিজনের সাথে সাক্ষাত করতে– আমার অজানা শ্বশুর বাড়িতে। দরোজায় আওয়াজ দিলাম। বাড়িটা ছিলো ওদের বেশ পুরোনো। অতি সাধারণ। বাড়িটির জীর্ণদশা বলে দিচ্ছিলো– এর অধিবাসীরা দারিদ্র-পীড়িত।

ওর বড় ভাই দরোজা খুললো। হাড্ডিসার এক যুবক। আমার বেচারি স্ত্রী– ভাইকে সামনে দেখে খুশিতে আটখানা। নেকাব খুলে ভাইটিকে লক্ষ্য করে 'মিলন-হাসি' হাসলো। তাকে উষ্ণতা ছড়িয়ে হাল-পুরসি করলো। আলিঙ্গন করলো।

এ দিকে ভাইটির অবস্থা কেমন ছিলো? নিরাপদে বোনের ফিরে আসায় ও যেমন আনন্দিত আবার কালো কাপড়ে তার সর্বাঙ্গ ঢাকা থাকায় ঠিক ততোটাই বিস্মিত।

আমি ওর পেছনে পেছনে ভিতরে প্রবেশ করলাম। বৈঠকখানায় বসলাম। আমি একাই সেখানে বসলাম। আর ও চলে গেলো অন্দর মহলে। ভিতরে গিয়ে ও রুশভাষায় কথা বলছিলো। আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

কিন্তু অনুমান করতে কষ্ট হলো না যে, ভিতরের পরিবেশটা ধীরে ধীরে ধুমায়িত হয়ে উঠছে। ভেসে আসছে আমার কানে ধারালো কথার বাক্য হৈচৈ, চীৎকার। সবাই ওকে ঘিরে ক্ষোভ প্রকাশ করছিলো। চীৎকার করছিলো। ও সবাইকে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছিলো।

আমি শঙ্কা অনুভব করলাম। ওর প্রতি জুলুমের আশঙ্কা করলাম। কিন্তু আমি কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছিলাম না ভাষা-অজ্ঞতার কারণে। পরিস্থিতির নাজুকতাও আঁচ করতেও পুরোপুরি ব্যর্থ হলাম।

হঠাৎ মনে হলো— চীৎকার-চেঁচামেচিটা আমার নিকটবর্তী হচ্ছে। ধীরে ধীরে আরো কাছে আসছে। আরো কাছে। একেবারে আমার মুখের উপরে! দেখলাম এক বৃদ্ধ উত্তেজিত তিন যুবককে নিয়ে আমার দিকে তেড়ে আসছে। আমি প্রমাদ গোনলাম। প্রথমটায় ভেবেছিলাম— তারা বুঝি মেয়ে-জামাইকে স্বাগত জানাতেই আসছে। কিন্তু ভাষা-অজ্ঞতাকে তিরস্কার করলাম। তারা আমাকে স্বাগত জানাতে এসেছে বটে, কিন্তু থালাভরা মিষ্টান্ন নিয়ে নয়, বরং 'কোচড়-ভরা' কিল-ঘুষি নিয়ে! একটু পরই সব কিল-ঘুষি আমার উপর উজাড় করে দিলো। আমার একটু আগের জামাই বরণ-চিন্তা বদলে গেলো নিমিষেই নিষ্ঠুর কিল-ঘুষিতে!

আমি আরব রক্তের সন্তান। তাই প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার আপদ-মস্তককে কেন্দ্র করে ষোলটি হাত-পায়ের নিষ্ঠুর সঞ্চালন আমাকে কাবু করে ফেললো। আমি চীৎকার করে করে সাহায্য প্রার্থনা করতে লাগলাম। অনুভব হলো— শক্তি আমার নিঃশেষ হয়ে আসছে। আরো অনুভব হলো— এখানেই বুঝি আজ আমি শেষ হয়ে যাবো। ওদের কিল-ঘুষি-লাথি ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠলো। জীবন বাঁচানোর আকুতি নিয়ে আমি কেবল দরোজাটা খুঁজছিলাম। চেষ্টা তো করতেই হবে! যদি পালিয়ে জানটা বাঁচানো যায়!

হঠাৎ দরোজাটা নজরে পড়লো। হঠাৎ অচিন্তনীয়ভাবে দরোজা লক্ষ্য করে দিলাম একটা ভোঁ-দৌড়! শরীরের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে। দ্রুতহাতে দরোজাটা ফাঁক করে পালালাম। ছুটতে লাগলাম। ওরাও আমার পেছনে পেছনে ছুটে ছুটে আসছিলো। আমি দ্রুত লোক-সমাগমের ভিতরে ঢুকে পড়লাম। এবং তাদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেলাম।

তারপর কোনো রকমে ঘরে এসে নিশ্চিন্ত হলাম। ভাগ্যিস! ঘরটা বেশী দূরে ছিলো না। গোসলখানায় ঢুকে নাকে-মুখে লেগে থাকা রক্ত ধুইলাম। নিজের দিকে একটু ভালো করে তাকালাম। আঁতকে উঠলাম। কিল-ঘুষি আর লাথির আঘাতে নাকে-মুখে-দেহে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে ছোপ ছোপ রক্ত। মুখ থেকে বের হচ্ছে গলগল করে তাজা রক্ত। বের হচ্ছে নাক থেকেও। বেয়ে বেয়ে তা ছড়িয়ে পড়ছে আমার বিধ্বস্ত দেহে, ছিন্নভিন্ন পাঞ্জাবীতে। মনে হচ্ছিলো– আমি যুদ্ধ-ফেরৎ এক আহত সৈনিক। তবুও হাজার শোকর আল্লাহ্‌র। তিনি আমাকে জানে বাঁচিয়ে দিয়েছেন এই পশুদের হাত থেকে!

কিন্তু পরক্ষণেই মনটা আবার ব্যথায় কাতর হয়ে গেলো। আমি তো বেঁচে গেলাম! আমার স্ত্রীর কী অবস্থা? ওরা যদি ওকে মেরে ফলে? ..

আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগলো ওর হিজাব-ঢাকা ছবি! সেও কি আমার মতো অমন নির্দয় নিষ্ঠুর প্রহারের মুখোমুখি হয়েছে? আমি তো পুরুষ। ধৈর্য দিয়ে, শক্তি দিয়ে এবং তাৎক্ষণিক বুদ্ধি দিয়ে পরিস্থিতি সামলে উঠতে পেরেছি। সে তো এক অবলা নারী! পারবে কি সইতে!! আমার বড্ড আশঙ্কা হচ্ছে– আমার স্ত্রী ভেঙ্গে পড়তে পারে!!

বিচ্ছেদের সময় কি ঘনিয়ে এসেছে?

শয়তানের কাজ শয়তানি করা। সে শয়তানি শুরুও হয়ে গেলো। শয়তান আমার মনে ঢুকিয়ে দিলো নানা দুশ্চিন্তা ও অচিন্তা– 'তোমার স্ত্রীর আশা বাদ দাও। ধর্মত্যাগীনী ও হবেই হবে। ও ফিরে যাবে খৃষ্টধর্মে। তোমাকে দেশে ফিরতে হবে একা, সঙ্গিনীবিহীন!'

আমার চিত্তটা বড়ো অস্থির হয়ে উঠলো। অজানা-অচেনা দেশ। কোথায় যাবো, কী করবো? আমি পত্র-পত্রিকায় পড়েছি– এ-দেশে জীবনের বিশেষ কোনো মূল্য নেই। কাউকে মারতে হলে দশ ডলারেই ভাড়াটে খুনী পাওয়া যায়।

ওহ! কী হবে অবস্থা? যদি আমার স্ত্রী অত্যাচারের মুখে ঈমান ছেড়ে কুফরীতে ফিরে যায় এবং আমার বর্তমান অবস্থান বলে দেয়– ঐ পাষণ্ডদের? তখন ওরা যদি ভাড়াটে খুনী পাঠিয়ে আমাকে ....? না!

আর ভাবতে পারছি না!

রাতটা কাটলো আমার ভীষণ দুর্ভাবনায়। ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় কোনোভাবেই চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। সকালে ছদ্মবে ধারণ করলাম। দূর থেকে আমার স্ত্রীর খবরাখবর জানার জন্যে এ গোয়েন্দার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলাম।

সারা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। বেরুতে ইচ্ছে করছিলো না। কিন্তু কর্তব্যে ডাকে সাড়া না দিয়ে কাপুরুষতার অপবাদ মাথায় নেবো– তেমন পুরু আমি নই। তাই ব্যথা-জর্জরিত দেহটা টেনে নিয়েই ওদের বাড়ির কা একটা সুবিধাজনক জায়গায় অবস্থান নিলাম। সেখান থেকে ওদের বাড়ি পরিস্কার দেখা যাচ্ছিলো। বাড়ির দিকে তাকিয়ে রইলাম। সবকিছু নিরীক্ষ করছিলাম। বাড়ির ফটক আটকানো। আমি বসেই থাকলাম। উত্তেজনাপূ প্রহর কাটাতে লাগলাম। হঠাৎ দেখলাম ফটক খুলে একজন প্রৌঢ় বে হচ্ছেন। সাথে সেই যুবক তিনটি, যারা সবাই মিলে 'ভগ্নিপতিবে পিটিয়েছিলো।

মনে হচ্ছে এরা কাজে যাচ্ছে। ফটক আবার বন্ধ হয়ে গেলো। একটা ব তালাও ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। আমি নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণে ওঁৎ পে বসেছিলাম। আমার স্ত্রীর মুখ দেখার জন্যে আমার দৃষ্টি ছিলো ব্যাকু চঞ্চল। কিন্তু না! কোনো লাভ হলো না।

এ অবস্থায় আমার কেটে গেলো ঘন্টার পর ঘন্টা। এর মধ্যেই দেখলা আমার 'শ্বশুর' তার তিন জোয়ানকে নিয়ে ফিরে এসেছেন। আমি ভীষ ক্লান্তি অনুভব করলাম। দুশ্চিন্তার পাহাড় মাথায় করে ফিরে গেলাম।

পরদিন আবার এসে আমার সতর্ক অবস্থান গ্রহণ করলাম। অপেক্ষা অপেক্ষায় এবং পর্যবেক্ষণে পর্যবেক্ষণে কেটে গেলো অনেক বেলা। আবা ফিরে এলাম ঘরে। ক্লান্তি নিয়ে, শ্রান্তি নিয়ে। রাজ্যের দুশ্চিন্তা নিয়ে দ্বিতীয় দিনের ব্যর্থতা নিয়ে।

এলো তৃতীয় দিন। না! আজো কোনো লাভ হলো না। স্ত্রীর কোনো খব পেলাম না। আমি ধীরে ধীরে ভেঙে পড়তে লাগলাম। হতাশা আমা চেপে ধরলো। বারবার এ-আশঙ্কা আমার মনকে তছনছ করে দিচ্ছে– ও

আমার প্রিয়তম স্ত্রীকে মেরে ফেলে নি তো! শাস্তির তাণ্ডবে তার মৃত্যু হয় নি তো?!

কিন্তু সাথে সাথে মন থেকে এ-আশঙ্কাটা ঠেলে দূর করে দিলাম। ভাবলাম- ও যদি মরে যেতো তাহলে নিদেনপক্ষে ঘরে লোকজনের আনাগোনা বেড়ে যেতো। একটা অস্বাভাবিক পরিবেশ বিরাজ করতো। কিন্তু এ-সব তো কিছুই আমার চোখে পড়ে নি! আমি মনকে প্রবোধ দিতে লাগলাম-

'অপেক্ষা করো মন! ও নিশ্চয়ই বেঁচে আছে! শিগ্রই তার দেখা পাবে!!'

দেখা হলো তার সাথে

চতুর্থ দিনও আমি ঘরে বসে থাকতে পারলাম না। ছুটে গেলাম ওর বাড়ির কাছে। যথারীতি দেখলাম বাপ-বেটারা কাজে বের হয়ে চলে গেলো। আমি অপলক তাকিয়ে রইলাম জীর্ণ বাড়িটার দিকে।

হঠাৎ দেখলাম ফটকটা খুলে গেছে! আরো দেখলাম ফটকের মুখটায় আমার স্ত্রীর মুখটাও দেখা যাচ্ছে। ও এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। আমি গভীরভাবে তাকালাম ওর দিকে। মনটা হাহাকার করে উঠলো। দেখলাম আমার চেয়ে ওর অবস্থা আরো বেশী খারাপ। সীমাহীন কিল-ঘুষি ও কামড়ে ওর চেহারার বেহাল অবস্থা! চেহারার লাল-নীল দাগগুলোই বলে দিচ্ছিলো- নির্যাতনের কী ঝড় বয়ে গেছে ওর উপর দিয়ে। ওর পরনের কাপড়টাও লালে লাল।

আমি ওর করুণ দশা দেখে আঁতকে উঠলাম। পারিপার্শ্বিকতা দূরে ঠেলে ছুটে গেলাম তার একেবারে নিকটে! আরো গভীর করে ওকে দেখলাম। মনটা হু হু করে কেঁদে উঠলো। ওর মুখের ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত ঝরছিলো। হাত-পা'ও রক্তাক্ত। পরনের কাপড় প্রায় ছিন্নভিন্ন। কোনো রকমে সতরটা ঢাকা আছে। পা শেকল-বাঁধা। হাতও পেছন দিক থেকে শেকল-বাঁধা। আমি আর সইতে পারলাম না, ঢুকরে কেঁদে উঠলাম! তার নাম ধরে ডেকে উঠলাম!

তার অবিচলতা

তার অসিয়ত

বেদনাক্র মুহূর্তে মুহূর্তে ও আমাকে বললো–

'খালেদ! আমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি! আমার জন্যে মোটেই উদ্বিগ্ন হবে না! কসম মহান আল্লাহর, যিনি ছাড়া নেই কোনো ইলাহ! আমি এখন যে জুলুম ভোগ করছি, তা নবী-রাসূলগণ এবং সাহাবী-তাবেঈগণ যে জুলুম-নির্যাতন সয়েছেন তার সামনে কিছুই না। চুল পরিমাণও না। সাবধান, তুমি ভুলেও আমার পরিবারের কারো মুখোমুখি হবে না। এক্ষুণি তুমি ফিরে যাও। ঘরে বসেই আমার অপেক্ষা করো। আমি আসবো। আসবোই। ইনশা আল্লাহ! তুমি দু'আ ও কান্নাকাটি বাড়িয়ে দাও। নফল নামাজ বাড়িয়ে দাও। শেষ রাতের কান্না বাড়িয়ে দাও। বিপদ মুকাবিলায় নামাজ এবং দু'আর অস্ত্র– সবচে' বড় অস্ত্র।'

আমি ফিরে এলাম আমার ঘরে। বসে বসে অপেক্ষা করলাম পুরো দিন। রাতটাও। না, সে এলো না।

এভাবে আরেকটি দিন কেটে গেলো। সেদিনও সে এলো না। তৃতীয় দিনও প্রায় শেষের পথে। দিন শেষে নেমে এসেছে রাত্রি। ধীরে ধীরে বাড়ছে রাত্রি। বাড়ছে আমার হৃদপিণ্ডের স্পন্দনও। হঠাৎ শুনলাম দরোজায় কে যেনো আওয়াজ দিচ্ছে। ভীত-সন্ত্রস্তচিত্তে ভাবতে লাগলাম– 'এতো রাতে কে দরোজায়? কে হতে পারে? আমার স্ত্রী নয় তো? নাকি ওর পরিবার আমার অবস্থান জেনে ফেলেছে এবং আমাকে শেষ করে দিতে ভাড়াটে খুনী পাঠিয়েছে? সম্ভবত স্ত্রী আমার সইতে না পেরে সব বলে দিয়েছে! মনে হয় ওরা এসেছে এখন আমাকে কতল করতে! মৃত্যুশীতল ভয়ে আমি কাঁপতে লাগলাম। মৃত্যু এবং আমার মধ্যকার ব্যবধান কি তাহলে একেবারেই কমে এসেছে? তবু উঠে দাঁড়ালাম। মনটাকে বশে রাখার চেষ্টা করলাম। হায়াত মওতের মালিক তো আল্লাহ! আমি এগিয়ে গেলাম। দরোজায় কান পেতে কাঁপাকাঁপা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম–

'কে দরোজায়? কে এতো রাতে?'

তখন ভেসে এলো আমার স্ত্রীর কণ্ঠ! ও ধীর শান্ত কণ্ঠে বলছে–

'খালেদ, দরোজা খোলো! আমি এসেছি। ভয়ের কিছু নেই।'

আমি আলো জ্বেলে দরোজা খুলে দিলাম। আমার স্ত্রী বিধ্বস্ত অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করলো। সারা দেহে ক্ষত। ছোপ ছোপ রক্ত। কাল বিলম্ব না করেই ও আমাকে বললো–

'এক্ষুণি আমাদেরকে এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে!'

আমি বললাম–

'কিন্তু তোমার এই নাজুক অবস্থায়?'

'হ্যাঁ, কোনো উপায় নেই। জলদি! এখানে থাকা এখন বিপজ্জনক!'

পরিস্থিতির নাজুকতার পুরো উপলব্ধি আমারও ছিলো। তাই দ্বিমত করলাম না। কাপড়-চোপড় দ্রুত একটা ব্যাগে ভরলাম। ও নিজেও ওর ব্যাগ গোছাতে লাগলো। ও নিজের পোষাকটা একটু বদলে ফেললো। হিজাবের উপরে পরলো একটা লম্বা ঢিলেঢালা আবা। সবকিছু নিয়ে আমরা নীচে নেমে এলাম। আল্লাহ্‌র মেহেরবানী, একটা ভাড়া-গাড়ি পেয়ে গেলাম। আমার স্ত্রী ক্লান্ত ক্ষুধার্ত নিপীড়িত দেহটা নিয়ে গাড়ির আসনে বসলো।

বিমানবন্দরের পথে

প্রথমে গাড়িতে উঠেছিলাম আমি। উঠেই চালককে বললাম রুশ ভাষায়–'বিমানবন্দর'। কিছু কিছু রুশ শব্দ ততোদিনে আমার আয়ত্ত হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু স্ত্রী বললো–

'না, এখন বিমানবন্দরে যাওয়া নিরাপদ নয়। আমরা বরং যাবো সামনের গ্রামে।'

আমি বললাম–

'তা কেনো? আমরা তো এ-দেশ ছেড়ে পালাতে চাই!'

'তা ঠিক, কিন্তু এ বিমানবন্দর থেকে নয়। কেননা আমার খবরটা জানাজানি হয়ে গেলেই ওরা হুমড়ি খেয়ে পড়বে এসে এখানে, এ বিমানবন্দরে। আমরা বরং কোনো গ্রামে গিয়ে এখন আশ্রয় নেবো।

তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবো।'

চালককে যে গ্রামের কথা বলা হয়েছিলো আমরা সেখানে ততোক্ষণে (গেছি। নেমেই আরেকটি গাড়িতে করে অন্য আরেকটা গ্রামের ছুটলাম। তারপর আরেকটা গ্রামের দিকে। এভাবে গ্রামের পর পেরিয়ে উপনীত হলাম এমন একটা শহরে, যেখানে আন্তর্জা বিমানবন্দর রয়েছে।

বিমানবন্দরে পৌঁছেই আমরা দেশে ফেরার টিকেট 'বুক' করলাম। যাত্রা ছিলো বিলম্বিত। তাই শহরে দিন কয়েক থাকার আয়োজনে হতে হলো। একটা ছোট্ট ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে উঠে পড়লাম।

ঘরে যখন আমরা কিছুটা স্থিত হলাম এবং শঙ্কা ও আশঙ্কা দূর হয়ে গে তখন আমার স্ত্রী তার রাশিয়ান আবাটা খুলে ফেললো। আমি ওর পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম।

হায় আল্লাহ!

দেখলাম অত্যাচার থেকে তার শরীরের কোনো অংশই বাদ যায় নি।

দেহের চামড়া ক্ষত-বিক্ষত।

এখানে ওখানে ছোপ ছোপ জমাট রক্ত।

কেশগুচ্ছের উপর দিয়ে বয়ে গেছে সংহারী তুফান।

ওষ্ঠদ্বয় বেদনা-নীল।

কিন্তু চোখ দু'টো তার জ্বলছিলো–

স্বর্গীয় আভায়।

ঠিকানা-পাওয়া মানুষের জ্যোতির্লোকে।

ওর চোখ দেখে আমি ভাবতেই পারছিলাম না–

ওর দেহটা বিধ্বস্ত।

আমার নীরব দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসতে লাগলো বেদনায় আনন্দে– অমন করে জাহান্নামের উপর হাসতে দেখে– পুষ্পের হাসি!

আমি অন্দরে গিয়ে সবাইকে সালাম করলাম। বসলাম আমার প্রিয় পরিবারের মাঝে।'

তারা আমার কাছে জানতে চাইলো–

'এ আবার কী ধরনের পোষাক পরে এসেছো?'

বললাম–

'এ ইসলামের পোষাক।'

'ইসলামের পোষাক! সাথের লোকটি কে?!'

'আমার স্বামী! আমি ইসলাম কবুল করেছি। এ মুসলিম লোকটির সাথে আমার বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে।'

তারা তখন বললো–

'এ কিছুতেই হতে পারে না। এ কিছুতেই আমরা মেনে নেবো না।'

আমি বললাম–

'আগে আমার কাহিনী শোনো! তারপর যা বলার বলো!'

এরপর আমি ঐ ভণ্ড-বণিকটির কাহিনী তাদেরকে শুনালাম। বললাম সে কীভাবে আমাকে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করতে চেয়েছিলো তারপর কী করে আমি তার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে তোমাদের বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিলাম।

এরপর তারা স্বরোষে আমাকে বললো–

'এ ঘর থেকে তুমি আর কক্খনো বেরুতে পারবে না! হয় ফিরে আসবে খৃষ্টধর্মে নয় এখান থেকে বেরুবে তোমার লাশ!'

এরপর এরা আমাকে বেঁধে ফেললো। এবং তোমার দিকে ছুটে এলো। তোমাকে মারতে লাগলো। আমি শুনছিলাম তোমার চীৎকার ও আর্তনাদ। তুমি পালিয়ে যাওয়ার পর ওরা আবার আমার কাছে ফিরে এলো। গালি ও তিরস্কারের বিষাক্ত তীর নিক্ষিপ্ত হতে লাগলো আমার উপর।

এরপর ওরা বাজার থেকে শেকল কিনে এনে আমাকে শক্ত করে বাঁধলো। তারপর শুরু হলো নিষ্ঠুর বেত্রাঘাত। প্রতিদিন নতুন নতুন ও অদ্ভুত অদ্ভুত বেত ব্যবহার করতো ওরা। বেত্রাঘাত শুরু হতো আসরের পর থেকে আর একটানা চলতো গভীর রাত পর্যন্ত। সকালে আমাকে পেটানোর কেউ থাকতো না। সবাই কাজে বেরিয়ে যেতো। মা আর পনের বছরের ছোট্ট বোনটা শুধু বাড়িতে থাকতো। বোনটাও আমাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করতো। এ সময়টাতেই আমি একটু নিস্কৃতি পেতাম নিষ্ঠুর বেত্রাঘাত থেকে। কেননা রাতে বেহুঁশ না হওয়া পর্যন্ত বেত্রাঘাত থামতো না।

ওদের দাবি একটাই– আমাকে ইসলাম ছাড়তে হবে। বাপ-দাদার ধর্মে ফিরে আসতে হবে। আর আমি ক্রমাগত তা অস্বীকার করছিলাম। নির্যাতন সয়ে যাচ্ছিলাম। একদিন পাশে এসে আমার ছোট বোনটি বললো–

'আচ্ছা বলো তো, কেনো তুমি আমাদের স্বধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম কবুল করলে? কেনো ফিরে আসবে না– তোমার মা'র ধর্মে? তোমার বাবার ধর্মে? তোমার পূর্ব-পুরুষের ধর্মে?

'... তার জন্যে তিনি মুক্তির পথ বের করেই দেন।'

আমি আমার বোনের এ কৌতূহলকে গণীমত মনে করলাম। কেননা তাকে বোঝানোর এবং তার সাথে কথা বলার একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম। আমি শুরু করলাম তাকে বোঝাতে। ইসলামের ইতিহাস ও দর্শন খুলে খুলে এবং বোধগম্য ভাষায় তার সামনে উপস্থাপন করতে লাগলাম। ব্যাখ্যা করতে

লাগলাম তাওহীদ ও একত্ববাদের বাণী। ও ধীরে ধীরে প্রভাবিত হতে লাগলো। ইসলামের শাশ্বত পয়গাম ও সত্যতা ওর মনের আকাশে রাঙা আলো ছড়াতে লাগলো।

কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি যে ওর কাছ থেকে ইসলামের পক্ষে সুস্পষ্ট বক্তব্য আসবে তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি। আমার কথা শেষ হতে না হতেই ও বলে উঠলো–

'আপু! তুমি সত্যের উপর রয়েছো। ইসলামই সত্য ধর্ম। আমিও তোমার মতো ইসলাম কবুল করতে চাই!!'

আমাকে ও অবাক করে দিয়ে আরো বললো– ঠিক বড় ও বিচক্ষণ মানুষের মতো–

'আপু! তুমি ভেঙে পড়ো না। একটু ধৈর্য ধরো। আমি তোমাকে সহযোগিতা করবো। করবোই!'

আমি বললাম–

'বোন আমার! সত্যি যদি তুই আমাকে সহযোগিতা করতে চাস্ তাহলে আমাকে আমার স্বামীর সাথে একটু কথা বলিয়ে দেয়!'

এরপর থেকেই ও ছাদে বসে তোমাকে খুঁজে ফিরতো। নীচে নেমে নেমে আমাকে জিজ্ঞাসা করতো–

'আপু দুলোভাই দেখতে কেমন?'

আমি তখন ওকে তোমার আকার-আকৃতি বলে দিতাম।

এরপর একদিন ও ঠিকই তোমাকে আবিস্কার করে ফেললো এবং আমাকে এসে তোমার বর্ণনা দিলো। আমি বললাম–

'তুই ঠিকই ধরেছিস। ইনিই তোর দুলোভাই! আবার যখন তোর চোখে পড়বে সাথে সাথে আমাকে খবর দিবি।'

সেদিন তোমাকে দেখে ও আমাকে খবর দিলো এবং সত্যি সত্যি দরোজা খুলে দিলো। এরপরের কাহিনী তোমার জানা। আমি বেরিয়ে এসে তোমার সাথে কথা বললাম! কিন্তু ফটকের বাইরে আসতে পারলাম না। আমার হাত-পা ছিলো তিনটি শেকলে বাঁধা। দু'টোর চাবি ছিলো আমার আব্বুর

কাছে আর একটির চাবি ছিলো আমার বোনের কাছে। এ তৃতীয় চাবিটি দিয়ে ও আমাকে শেকলমুক্ত করে বাথরুমে নিয়ে যেতো। তোমার সাথে কথা বলার পর আমার বড়ো স্বস্তি অনুভব হলো।

এরপর আমার বোন ইসলাম কবুল করে ধন্য হলো। আমাকে শেকলমুক্ত করে তোমার কাছে পাঠানোর জন্যে ও এক গোপন অভিযানে নেমে পড়লো। ও নিজের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে আমার জীবন রক্ষা করার জন্যে রাতের ঘুম হারাম করে দিলো।

কীভাবে আমার ভাইয়ের কাছ থেকে চাবিটা কব্জা করা যায়– তার জন্যে ও 'ফন্দি-ফিকির' শুরু করে দিলো।

পরদিন আমার বোন ভাইদেরকে ঝাঁঝালো মদ পরিবেশন করলো। এ দায়িত্বটা ও-ই পালন করতো। সে মদ একটু বেশী করেই ওদেরকে খাওয়ানো হলো। ওরা পূর্ণ মাতাল হয়ে বিছানায় পড়ে থাকলো। আমার বোনটা এ সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগালো। আস্তে করে পকেট থেকে চাবিটা বের করে সোজা চলে এলো আমার কাছে। এসে বললো–

'প্রস্তুত হও! এক্ষুণি তোমাকে বেরুতে হবে!'

তারপর নিমিষেই ও আমাকে শেকলমুক্ত করে ফটক খুলে দিলো। অশ্রু ঝরিয়ে ঝরিয়ে বিদায় দিলো। আমি রাতের আঁধারকে আশ্রয় করে তোমার কাছে ফিরে এলাম!'

আমি এতোক্ষণ তন্ময়চিত্তে আমার স্ত্রীর মুখে তার মুক্তির কাহিনী শুনছিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম–

' কিন্তু তোমার বোন?! আমার প্রিয় শ্যালিকা? তার ভাগ্যে কী ঘটলো?!'

স্ত্রী হাসিমুখে বললো–

'শ্যালিকাকে নিয়ে অতো ভয় পেতে হবে না! ওকে আপাতত ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখতে বলেছি! যতোদিন না ওর কোনো ব্যবস্থা আমরা করবো!'

এরপর আমরা বাকি রাতটুকু ঘুমিয়ে কাটালাম।

আমরা নির্ধারিত সময়ে দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। দেশে পৌঁছেই আমি ওকে একটা ভালো হাসপাতালে ভর্তি করলাম। সেখানে ওর চিকিৎসা হলো। ও পুরোপুরি সেরে উঠলো। কিন্তু নির্যাতনের কিছু কিছু চিহ্ন তখনো রয়েই গিয়েছিলো।"[১]

প্রিয় বোন!

তোমার আবেগ-সমুদ্রে ঢেউ তোলার জন্যে আমি এ-গল্প বলি নি। তোমার চোখে বেদনার অশ্রু-প্লাবন বইয়ে দেওয়াও আমার উদ্দেশ্য নয়। তোমার বিবেক ও চেতনাকে উস্কে দেয়ার জন্যেও আমি এ কাহিনীর অবতারণা করি নি। আমি শুধু বলতে চেয়েছি–

ইসলামের আছে এমন একদল বীর, যারা শুধু ইসলামের নামে, শুধু ইসলামের তরে স্বপ্ন দেখে– বেঁচে থাকার কিংবা মরে যাওয়ার। ইসলামের সম্মান ও মর্যাদা বহাল রাখার জন্যে কিংবা প্রতিষ্ঠা করার জন্যে তাঁরা মাথার খুলি গুঁড়িয়ে দিতে, বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিতে এবং শরীরকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে– শিশুর অনাবিল হাসি মুখে নিয়ে।

অতীতের আবু জেহেল ও উমাইয়ারূপী দুশমনরা, কাফের-মুশরিকরা শাস্তি দিয়েছিলো বেলাল-সুমাইয়াকে। মনে রাখবে– আজো আছে সেরূপ আবু জেহেল-উমাইয়ারূপী দুশমনদের ভাবশিষ্য ও মানসপুত্ররা। এ দ্বীনকে ধরা-পৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে ব্যয় হচ্ছে তাদের দিনরাতের অষ্ট প্রহর।

বোন আমার!

তুমি যেনো ওদের শিকারে পরিণত না হও!

তুমি যেনো ইসলামের সম্মানজনক ও গৌরবময় কণ্ঠাহারকে গলা থেকে ছুঁড়ে ফেলে না দাও! তোমার সম্মান– ইসলামেরই দেওয়া সম্মান। এ-সম্মানের অমর্যাদা করবে না। এ-সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে তোমাকে

১. গল্পটি ড. ইবরাহীম আল-আরেফ লিখিত একটি বই থেকে গৃহীত.

সাবধান ও সচেতন থাকতে হবে। সব সময়।

এসো! ইতিহাস থেকে আলো গ্রহণ করি!

জানো! পবিত্র কা'বা'র প্রথম বাসিন্দা কে?

তিনি পুরুষ নন– নারী! অবশ্যই গর্বিত নারী! হাদীসের ভাষায় শোনো তাঁর কাহিনী–

ইমাম বোখারী রহ.-এর ভাষ্য অনুযায়ী হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম পবিত্র মক্কায় এসেছিলেন শাম দেশ থেকে। তখন তাঁর সাথে ছিলেন বিবি হাজেরা আর ছোট্ট শিশু ইসমাঈল। দুধের শিশু ইসমাঈল। আল্লাহর নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম– মা ও শিশু-ছেলেকে কা'বার কাছে রেখে চলে গেলেন। তখন কেমন ছিলো মক্কা? একদম অনাবাদ, বিরানভূমি! নেই লোকালয়ের চিহ্নমাত্র। নেই পিপাসা-কাতর পথিকের পিপাসা নিবারণের কোনো ব্যবস্থা। হ্যাঁ, এমন মক্কাতেই রেখে চলে গেলেন তিনি তাঁদেরকে। দিয়ে গেলেন না কিছুই– সামান্য খেজুর আর ছোট্ট মশকভরা অল্প পানীয় ছাড়া! তারপর ধরলেন তিনি আবার শাম-এর পথ।

ইসমাঈলের মা ভালো করে তাকালেন আশ-পাশে।

দেখলেন নির্জন ভীতিকর মরুভূমি।

সুউচ্চ পাহাড়।

কালো কালো পাথর।

নেই জীবন-সঙ্গী।

নেই গল্প-সঙ্গী।

নেই প্রিয়জনের কোলাহল।

কেমনে থাকবেন তিনি এই মরু-বিয়াবানে!

তাঁর জীবন তো কেটেছে মিসরের আলিশান প্রাসাদে!

এরপর কেটেছে শাম-এর সবুজে-ছাওয়া তৃণভূমিতে!

তার ঘন গাছপালাবিশিষ্ট কলমুখর উদ্যানে!

তিনি ভীষণ একাকীত্ব অনুভব করলেন।

তাকালেন স্বামীর দিকে। ঐ তো তিনি চলে যাচ্ছেন! একটু এগিয়ে গিয়ে বললেন–

'ইবরাহীম! এ জনমানবহীন মরুতে আমাদেরকে রেখে কোথায় চললেন আপনি?'

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কোনো জবাব দিলেন না। বিবি হাজেরার দিকে একটু ফিরেও তাকালেন না। বিবি হাজেরা আবার জিজ্ঞাসা করলেন– একই কথা। এখনো আল্লাহ্র নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পক্ষ থেকে কোনো সাড়া মিললো না। আবার ঝরে পড়লো বিবি হাজেরার কণ্ঠে উদ্বেগমাখা সেই জিজ্ঞাসা! এবারও আল্লাহ্র নবী নিরুত্তর, ভ্রুক্ষেপহীন। বিবি হাজেরা যখন দেখলেন প্রিয় স্বামী তাঁর প্রতি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করছেন না, বরং অজানা কারণে তিনি তাঁকে এড়িয়ে যাচ্ছেন, তখন প্রশ্নের ধরন ও বিষয়টাই বদলে ফেললেন তিনি। জানতে চাইলেন–

'তাহলে কি আল্লাহ্র হুকুমে আপনি আমাদেরকে এখানে রেখে যাচ্ছেন?!'

এবার শোনা গেলো হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ভরাট কণ্ঠের সংক্ষিপ্ত জবাব–

'হ্যাঁ!'

বিবি হাজেরা এ জবাবের জবাবে বললেন–

'তাহলে আল্লাহ্ই আমাদের জন্যে যথেষ্ট! আল্লাহ্র হুকুমের প্রতি আমি পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট! তিনি আমাদেরকে এখানে 'নষ্ট' করবেন না!'

এরপর হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ফিরে গেলেন শামে আর বিবি হাজেরা রয়ে গেলেন নিজের এ নতুন 'আবাসে'! মেনে নিলেন এ কঠিন ও নির্জন মরুবাস।

এদিকে চলতে চলতে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন একটি পাহাড়ের উপত্যকায় এসে নামলেন এবং স্ত্রী-পুত্রের দৃষ্টির আড়ালে চলে এলেন, তখন পথচলা বন্ধ করে দিলেন। থেমে গেলেন। দাঁড়ালেন বাইতুল্লাহ অভিমুখী হয়ে। তারপর দু'হাত প্রসারিত করলেন আসমানের দিকে। ভেঙে পড়লেন কান্নাঝরা কণ্ঠে–

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ.

'হে আমাদের রব! আমি আমার বংশধরদের মধ্য থেকে কয়েকজনের আবাস বানিয়ে গেলাম এক অনুর্বর উপত্যকায়– তোমার গৃহের নিকট। হে আমাদের প্রতিপালক! এ জন্যে যে, তারা যেনো সালাত কায়েম করে। সুতরাং তুমি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফল-ফলাদি দ্বারা তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করে দাও, যাতে তারা শোকর করতে পারে।'

এরপর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আর অপেক্ষা করলেন না, চলে গেলেন শামে। আর বিবি হাজেরা নজর দিলেন শিশুপুত্র ইসমাঈলের দিকে। তাকে দুধ পান করালেন। পান করালেন পিতার রেখে যাওয়া পানি। কিন্তু ছোট্ট মশকের অল্প পানি একদিন শেষ হয়ে গেলো। পিপাসার্ত হলেন তিনি। পিপাসায় কাতর হলো তাঁর দুধশিশুও। পিপাসা বাড়ে, সাথে সাথে বাড়ে শিশুর তড়পও। বাড়ে মায়ের বেতাবি ও বেকারারি! তীব্র পিপাসায় শিশুপুত্র মোচড়ায়, ঠোঁট চাটে, হাত-পা ছুঁড়তে থাকে জমিনে! পাশে দাঁড়িয়ে অসহায় মা দেখেন তাঁর শিশুর ছটফটানি, গড়াগড়ি! যেনো মৃত্যুর সাথে লড়ছে ও!! ব্যাকুল চোখে তাকান তিনি আশ-পাশে–

আছে কি কোনো দরদী বন্ধু? নেই!

আছে কি কোনো সাহায্যকারী? নেই!

কেউ নেই!

তাহলে কি তাঁর চোখের সামনে মরে যাবে প্রিয় মানিক?

তিনিই বা কী করে দেখবেন তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?

কিংবা পাশে বসে? .. তিনি উঠে গেলেন। ওর কাছ থেকে চলে গেলেন! মায়ের সামনে প্রিয় সন্তানের মৃত্যু হবে আর মা চেয়ে চেয়ে দেখবেন–

কিছুই তার করার থাকবে না– এতো হতে পারে না! কিন্তু যাবেন তিনি কোথায়? করবেনই বা কী? হঠাৎ চোখে পড়লো– সাফা পাহাড়টা! তাঁর নিকটতম পাহাড়। ছুটে গেলেন তিনি সেখানে। চড়লেন তার উপরে। যদি দেখা যায় সাফা থেকে কোনো বেদুঈন পল্লী কিংবা মরু কাফেলা! কিন্তু না! সাফা'র শীর্ষচূড়ায় উঠেও কোনো মানুষের কিংবা কোনো কাফেলার টিকিটিও দেখা গেলো না। নেমে এলেন তিনি সাফা থেকে। এবার ছুটে চললেন উপত্যকা ধরে– ঐ মারওয়া পাহাড়টার দিকে। উপত্যকার মধ্যখানে এসে জামার আঁচলটা একটু গুটিয়ে নিলেন তিনি। শ্রম-ক্লান্ত কর্মী-পুরুষের মতো দৌড়াতে লাগলেন তিনি– মারওয়া অভিমুখে। উপত্যকা পেরিয়ে দ্রুত উঠতে লাগলেন মারওয়ায়। চূড়ায় দাঁড়িয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন চারধারে। না, এখানে দাঁড়িয়েও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না পানির কোনো চিহ্ন। এখন তাহলে কী করা? আবার ছুটে যাবেন কি সাফায়? হ্যাঁ, আবার তিনি ছুটে গেলেন সাফায়। সেখান থেকে আবার মারওয়ায়। আবার সাফায়। আবার মারওয়ায়। এভাবে সাফা-মারওয়া করলেন তিনি– সাতবার!

সপ্তমবার যখন তিনি মারওয়ার কাছাকাছি চলে এলেন, তখনই শুনতে পেলেন একটা ধ্বনি! থমকে দাঁড়ালেন! আপন মনে বলে উঠলেন– 'চুপ'! ধ্বনিটি আবারো শোনার চেষ্টা করলেন। আবার বলে উঠলেন আপন মনে– 'একটু আগে কী শুনলাম আমি? আছে কি আশ-পাশে কোনো সাহায্যকারী?' না, এবারও কোনো সাড়া মিললো না। এবার তাকালেন তিনি শঙ্কাভরা চোখে তাঁর মানিকের দিকে! হায় আল্লাহ! তোমার কী কুদরত! কী কারিশমা তোমার কুদরতের!! ঠিক 'জমজম'-এর জায়গাটায় মানিক যে তাঁর পদাঘাত করছে! নাকি হাতাঘাত! আর ঐ তো ঠিক সেখান থেকেই মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে স্বচ্ছ পানির একটা বেগবান ধারা!

মা হাজেরা দ্রুত ছুটে গেলেন সেই পানির দিকে! আবে জমজমের দিকে! আবে হায়াতের দিকে!! দ্রুত-হাতে পাড় বাঁধলেন। পানি আটকালেন। তারপর আঁজলা ভরে পানি নিয়ে মশক ভরলেন। যদি পানি শেষ হয়ে যায়? কিন্তু পানি শেষ হচ্ছিলো না। তীব্র বেগে জমিন থেকে পানি উৎসারিত হচ্ছিলো। অদূরে দাঁড়িয়েই বুঝি মৃদু মৃদু হাসছিলেন স্বর্গীয় দূত হযরত জিবরীল আমীন! হ্যাঁ, কাছে এসে তিনি মা হাজেরাকে বললেন–

'শঙ্কিত হয়ো না হে নারী! এ পানি শেষ হবার নয়! ফুরিয়ে যাবার নয়! জানো না, এখানেই রয়েছে আল্লাহ্‌র ঘর! তা অচিরেই নির্মিত হতে যাচ্ছে এই শিশু আর তার পিতার হাতে!'

'হে পুণ্যবতী হাজেরা!

তোমার ধৈর্য অতুলনীয়!

তোমার ধৈর্যের কাহিনী বিস্ময়কর!

সঙ্গিন মুহূর্তে আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকে বাস্তবায়নের যে লড়াই তুমি করেছো এবং যে বীরত্ব তুমি প্রদর্শন করেছো– পৃথিবীর কোনো 'নারী ইতিহাসে' খুঁজে পাওয়া যাবে না– তার নজীর ও দৃষ্টান্ত। যাবেই না! তোমার নজীর শুধু তুমি! তোমার দৃষ্টান্ত শুধু তুমি! শুধুই তুমি!!'

এই হলো সংক্ষেপে বিবি হাজেরার মাহাত্ম্যগাথা। যাঁর ধৈর্যের কাহিনী, যাঁর ত্যাগের কাহিনী আজো অজুত নিযুত কণ্ঠে উচ্চারিত হয় এবং পাথেয় যোগায় অসংখ্য অগণিত হাজেরা-প্রেমীর চলার পথে। কিন্তু এ তো তাঁর সম্মানের .. মাহাত্ম্যের ছোট্ট একটি নিদর্শন! তিনি তো এ ক্ষুদ্রতা থেকে অনেক অনে-ক উপরে অবস্থান করছেন! তাঁর আলোচনা তো স্থান পেয়েছে পাক কুরআনের পাতায়ও! আল্লাহ তো তাঁকে সম্মানিত করেছেন নবী-পত্নী ও নবী-মাতা বানিয়েও! তিনি নবীদের মা! তিনি ওলী'দের আদর্শ!

হ্যাঁ, এই হলেন বিবি হাজেরা!

এই হলো তাঁর পুরস্কার!!

হ্যাঁ, তিনি মরুবাসী হয়েছেন!

সেখানে শঙ্কা-আশঙ্কারও শিকার হয়েছেন!

পিপাসার্ত হয়েছেন, ক্ষুধার্ত হয়েছেন!

কিন্তু যখন জেনেছেন এ-সবই কুদরতের ইশারায়,

তখন মেনে নিয়েছেন তিনি এ-কঠিন মরুবাস অবলীলায়!

তিনি নির্বাসিত জীবন যাপন করেছেন, কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে! তাই আল্লাহ পরে তাঁকে দিয়েছেন সুখ ও আনন্দ! দিয়েছেন ভাগ্য সুপ্রসন্ন! এমন নারীর এমন নির্বাসনকে লক্ষ্য করে তুমি যদি বলো– وطوبى للغرباء তাহলে

বলতেই পারো!!

জানো না কারা এই غرباء?

এরা আল্লাহর সৎ বান্দা! পুণ্যবান্দা!

হাজার হাজার বিজার বিজার অসৎ ও নষ্ট মানুষের ভিড়ে!

يقبضون على الجمر .. ويمشون على الصخر ..

ويبيتون على الرماد .. ويهربون من الفساد ..

যারা জ্বলন্ত আগুনকেও প্রয়োজনে আকড়ে ধরে,

কঠিন প্রস্তরকেও বানায় (মসৃণ) পথ!

আগুনঠাসা ছাইয়ের উপর এঁরা রাত কাটায়,

যতো আছে অন্যায়-অনাচার আর পাপ-পঙ্ক—

পালিয়ে বেড়ায় এঁরা তা থেকে— নিরন্তর!

হ্যাঁ, সত্যপুষ্ট ওদের কথা!

কোনো পাপস্পর্শ কলুষিত করেনি— ওদের লজ্জাস্থান!

দৃষ্টি ওদের নিষ্কলুষ, মুক্ত— পাপ-চাহনি থেকে!

ওদের কথায় নেই ছল-চাতুরীর রঙ ছিটানো!

ওদের মজলিস! নেই গীবত-শেকায়াত! পরনিন্দা-পরচর্চা!

ওরা যখন দাঁড়ায় আল্লাহর সকাশে—

সাক্ষি হয়ে যায় ওদের পক্ষে ওদেরই হাত-পা!

কথা বলে উঠে ওদের কান!

উজ্জ্বল হয়ে উঠে ওদের চোখ!

আল্লাহর সকাশে দাঁড়িয়েই ওরা আনন্দিত হয়!

সুসংবাদপ্রাপ্ত হয়েই ওরা আপ্লুত হয়!!

ওদের বিপক্ষে সাক্ষি দিতে পারে না–

এমন চোখ, যা দেখেছে পরনারী!

এমন কানও, যা শুনেছে অবৈধ গান!

বরং ওদের পক্ষে সাক্ষি হয়–

এমন চোখ, যা কেঁদে কেঁদে হয় সারা–

শেষ রজনীর নির্জন বেলায়!

আর দিবসে! থাকেন এঁরা পবিত্র!

যেনো চিক্‌চিক্ শিশির কণা!

যখনই আসে জিহাদের ডাক,

আত্মা বিলানো তখন ওদের জন্যে সবচে' সহজ কাজ!!

হ্যাঁ, এরাই غربا ء! তূবা লিল গোরাবা!!

হে নাম না-জানা নারী!
ধন্য তোমার কুরবানী!

এ কাহিনী ফেরাউন কন্যার এক পরিচারিকার। কেশবিন্যাসকারি ইতিহাস আমাদের জন্যে তাঁর নামটা সংরক্ষণ করে রাখে নি, তবে কর্ম সংরক্ষণ করে রেখেছে। তাঁর ত্যাগ সংরক্ষণ করে রেখেছে। কুরবানী সংরক্ষণ করে রেখেছে। সে ত্যাগের কাহিনীই এখন তো নিবেদন করছি।

তিনি ছিলেন এক সতী মহিলা। তিনি এবং তাঁর স্বামী ফেরাউনের অ থাকতেন। তাঁর স্বামী ছিলো ফেরাউনের প্রিয়ভাজন। নিকটজন।

ফেরাউনের আশ্রয়ে থাকলেও তাঁরা ঈমান কবুল করে ধন্য হয়েছি গোপনে গোপনে। হঠাৎ কী উপায়ে যেনো ফেরাউন মহিলাটির স ঈমান আনার কথাটা জেনে ফেলে। আর যায় কোথায়! সাথে সাথে এনে তাঁকে হত্যার নির্দেশ দিলো ফেরাউন।

কিন্তু মহিলার বিষয়টি গোপনই থাকে। ফেরাউনের মহলে তার মেয়েদের কেশবিন্যাস করে করে তাঁর সময় চলছিলো। বিনিময়ে যা পেতেন তা দিয়ে পাঁচ সন্তানের ভরণ-পোষণ চালাতেন বেশ কষ্টে। বড়ো ভালোবাসতেন তিনি তাঁর সন্তানদেরকে।

নিত্যদিনের মতো একদিন তিনি ফেরাউন-তনয়ার কেশবিন্যাস করছিলেন। অসতর্কতার মুহূর্তে হঠাৎ তাঁর হাত থেকে চিরুনিটা পড়ে গেলো। তখন হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত তাঁর ঈমান কথা বলে উঠলো! তাঁর মুখ ফসকে বেরিয়ে এলো– 'বিসমিল্লাহ'! তখন ফেরাউন-তনয়া বিস্মিত হয়ে বললো–

'আই! আল্লাহর নামে মানে আমার আব্বার নামে তো?!'

তখন কেশবিন্যাশকারিণী মহিলাটির ঈমানী শক্তি আরো জোরে কথা বলে উঠলো! ঈমানী জযবাকে কতোক্ষণ আর চেপে রাখা যায়? পারলেন না তিনি ঈমানকে লুকিয়ে রাখতে! তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন–

'অসম্ভব! বরং আল্লাহর নামে! যিনি আমার রব!! তোমার রব! তোমার আব্বারও রব!'

তখন ফেরাউন-তনয়া বেশ বিস্মিত হলো এই ভেবে যে, তার আব্বা ছাড়া আর কে প্রভু হতে পারেন? কার ইবাদত করা হতে পারে?!

ফেরাউন-তনয়ার পেটে কথাটা একেবারেই হজম হলো না। বিষয়টা সে বাবাকে জানিয়ে দিলো। ফেরাউনও বিস্মিত হলো। ভাবলো, তাহলে তার প্রাসাদে তাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো ইবাদতও চলে!

এরপরই শুরু হলো ফেরাউনী তাণ্ডব। সর্বগ্রাসী তাণ্ডব। কাল-বিলম্ব না করে মহিলাকে ডেকে পাঠানো হলো। আসতেই ফেরাউন জিজ্ঞাসা করলো–

'তোমার রব কে?'

মহিলাটি জবাবে বললেন–

'আমার এবং আপনার রব একজন! তিনি হলেন– আল্লাহ!'

সাথে সাথে ফেরাউন তাঁকে বন্দি করার হুকুম করলো। তাঁকে তার বিশ্বাস থেকে সরে আসার নির্দেশ দিলো। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যে চলতে লাগলো অমানবিক বেত্রাঘাত।

কিন্তু ফেরাউন যা ভেবেছিলো তা হলো না। মহিলা ঈমান ত্যাগ করলেন না। ফেরাউন তখন পিতলের একটা ইয়া বড় পাতিল আনালো। তারপর তেল ভরে গরম করলো। তেল গরম হতে হতে টগবগ করতে লাগলো। এরপর সে মহিলাকে পাতিলের কাছে আনার নির্দেশ দিলো। মহিলা এতো এ-সব আয়োজন দেখে বুঝতে পারলেন– তাঁর আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। কিন্তু ঘাবড়ালেন না। ঈমানের পথ থেকে সরে এলেন না। ভাবলেন– জীবন তো একটাই! ঈমান আনার কারণে এই এক জীবনের সেতু পেরিয়ে সময়ের পূর্বেই যদি 'দীদারে মাওলা' নসীব হয়, তাহলে কেনো আমি 'লাব্বাইক' বলবো না?!

ফেরাউন জানতো– মহিলার কাছে সবচে' প্রিয় হলো তাঁর পাঁচ এতিম সন্তান। ওদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে সে তার প্রাসাদে কাজ করেছে। ফেরাউন চাইলো– মহিলাকে আঘাত করতে, শক্ত আঘাত! 'ফেরাউনী' আঘাত! তাই সে তাঁর পাঁচ সন্তানকে তাঁর সামনে হাজির করলো।

ধরে আনার সময় ওরা বুঝতে পারছিলো না কোথায় তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং কেনো? কিন্তু যখন মা'কে দেখলো শেকলবাঁধা, ঝাঁপিয়ে পড়লো তাঁর কোলে!

কাঁদতে কাঁদতে মাও তাদেরকে আকড়ে ধরলেন!

মুখে মুখে মুখ মিলালেন!

চোখে চোখে চোখ ঘষলেন!

এতিম মানিকদের শরীরের ঘ্রাণ নিলেন!

স্নেহাশ্রুর টপটপ ফোঁটা ওদের উপরে 'ঢালতে' লাগলেন।

একেবারে ছোট্ট মানিকটিকে তিনি বুকে তুলে নিলেন!

সোহাগভরে দুধ খাওয়ালেন!

ফেরাউন 'মাতৃমমতা'র এ-দৃশ্য দেখে মনে মনে হাসলো। শুরু করলো নিষ্ঠুরতার খেলা! বড় ছেলেটিকে টগবগে তেলে ফেলে হত্যা করার নির্দেশ দিলো! সৈন্যরা সাথে সাথে তার হুকুম তামিল করতে ওকে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো সেই গরম তেলের দিকে! আহ! অবুঝ ছেলেটার সে কী কান্না! 'মা! মা!' বলে ও চীৎকার করছিলো! সৈন্যরা

কাছে মিনতি করছিলো। ফেরাউনের কাছে অনুনয়বিনয় করছিলো! কান্নার দমকে গমকে হাত-পা ছুঁড়ছিলো। করুণ কণ্ঠে ডাকছিলো ছোট ভাইদের নাম ধরে ধরে। এদিকে পাষণ্ড সৈন্যরা ওর হাতে আঘাত করছিলো। মুখে থাপড় মারছিলো। মা করুণ চোখে তাকিয়ে রইলো প্রিয় সন্তানের দিকে। অশ্রুঝরা দৃষ্টিতে! বিদায়মাখা চাহনিতে!!

কিছুক্ষণের ভিতরেই বালকটিকে নিক্ষেপ করা হলো ফুটন্ত তেলে!

মা এ অসহনীয় দৃশ্য দেখলেন দম বন্ধ করে!

আঁখিনীরে বুক ভাসিয়ে!

ভাইয়েরা সহোদরের অমন করুণ অবস্থা দেখে মুখ ঢাকলো— ছোট ছোট কোমল হাতে! ওদের আর্ত চীৎকার থেকে যেনো ভেসে আসছিলো—

'তোমরা কেনো আমাদের ভাইয়াকে মেরে ফেললে?

এখন কে আমাদেরকে আদর করবে?

তোমরা খারাপ!

তোমরা নষ্ট!

তোমরা অমানুষ!'

মুহূর্তেই ছোট্ট দেহের রেশম-কোমল হাড্ডিগুলো গলে গেলো! সাদা হয়ে উপরে ভেসে উঠলো! ফেরাউন এরপর তাকালো মহিলার দিকে! কুটিল চোখে! নিষ্ঠুর পাশবিকতায় নৃত্য করছিলো তার চোখের তারা! ফেরাউন মহিলাকে আবার ঈমান তরক করতে বললো। মহিলাও আবার অস্বীকার করলেন। ফেরাউন আরো ক্ষুব্ধ হলো। দ্বিতীয় সন্তানটিকে তেলে নিক্ষেপ করার হুকুম দিলো। তখন সৈন্যরা মায়ের কাছ থেকে তাকেও আগের মতো টেনে নিয়ে গেলো। একটু পর সেও নিক্ষিপ্ত হলো তার ভাইয়ার মতো! মা এক সন্তানের চলে যাওয়া দেখেছেন একটু আগে। এখন দেখছেন আরেকজনের চলে যাওয়া! অশ্রুপ্লাবিত চোখে! হ্যাঁ, একটু পর তার হাড্ডিও গলে গেলো! সাদা হয়ে উপরে ভেসে উঠলো! না! মা এখনো অবিচল! ঈমানও তাঁর অটল! তাঁর রব-এর সাথে মিলন-স্বপ্নে তবুও তিনি বিভা-বিভোর!

এরপর এলো তৃতীয়জনের পালা। একই নিষ্ঠুরতায়! না! তবুও মা টললেন

না! ঈমান থেকে ফিরে গেলেন না ফেরাউনের প্রভুত্বে! প্রভুত্ব আল্লাহ্‌র! এ বিশ্বাস থেকে টলে গেলে যে জাহান্নামের তপ্ত আগুন হবে সময়ের ঠিকানা!

মা'র অবিচলতা দেখে ফেরাউনের মাথায় রক্ত ঘোরপাক খেতে লাগ এলো এবার চতুর্থ সন্তানের পালা। একই নিষ্ঠুরতায় চালানো হলো এ তাণ্ডবলীলা। ও ছিলো বেশ ছোট! মায়ের আঁচল ধরে সে কী কান্না! সে চীৎকার! পাহাড়-টলা চীৎকার! সৈন্যরা যখন টেনে ওকে মায়ের আঁচল করলো, তখন ও ঝাঁপিয়ে পড়লো মায়ের পায়ে! আকড়ে ধর মাতৃপদযুগল! শিশুময় অশ্রুতে ভেসে গেলো যুগলপদ! তবু ফেরাউ নিষ্ঠুর হৃদ-সমুদ্রে দয়া-মায়ার বাতাস বইলো না! তরঙ্গ তো উঠলোই মা ওকে আবার কোলে নিতে চাইলেন। চুমু দিয়ে শেষ বিদায় দি চাইলেন! বাঁধ সাধলো নিষ্ঠুর সৈন্যরা! ছোট্ট শিশু! মুখে ঠিকমত ক ফোটে নি! শোনা যাচ্ছিলো শুধু অবোধগম্য আওয়াজের কাতর মিনতি! বোঝা ভাষায় কী বলছিলো ও? ও কি বলছিলো–

'মা! আমি মরতে চাই না! আমি বাঁচতে চাই! আমি চলে গেলে আ ছোট্ট ভাইয়াটিকে রোজ রোজ কে আদর করবে? চুমু খাবে? মা! সত্যি ফেরাউন আমাকে এই গরম তেলে পুড়ে মারবে? কেমনে সইবো ত আগুনের তাপ?'

কয়েক মুহূর্ত পরেই ভেসে উঠলো ছোট্ট শিশুটির সাদা সাদা কোমল হা একে একে চারটি মানিকের নৃশংস হত্যা দেখলেন স্নেহময়ী মা– তাকি তাকিয়ে! নীল বেদনায় পাথর হয়ে! তাঁর দু'চোখে বয়ে চলেছে শোকা অবাধ বন্যা!

আহ! তাঁর সন্তানদের চিরবিচ্ছেদ-বেদনা কেমনে সইবেন তিনি? বিশে এইমাত্র নিষ্ঠুরতার বলি হওয়া ছোট্ট মানিকের বেদনা? যাকে কতো আ দিয়েছেন তিনি! দিয়েছেন কতো সুহাগমাখা চুমু! ও যখন রাত্রিতে ঘুমো না, তাকেও তখন নির্ঘুম রাত কাটাতে হতো। ও যখন কাঁদতো তি কাঁদতেন। রাতের পর রাত ও তাঁর কোল জড়িয়ে .. বুক জ ঘুমিয়েছে। তাঁর চুল নিয়ে খেলা করেছে। মাঝে মধ্যে তিনি নি হয়েছেন ওর খেলার সঙ্গিনী। ও আজ নেই! ও আজ নিষ্ঠুরতার শি হায়! এমন বেদনা যে সইবার নয়!

মহিলাটি বারবার চোখে আঁচলচাপা দিচ্ছিলেন। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। এরই মাঝে নিষ্ঠুর সৈন্যরা তাঁর দিকে আবার এগিয়ে এলো। যেনো একদল দানব এগিয়ে আসছে ধাক্কাধাক্কি করতে করতে!

দুগ্ধপোষ্য শিশুর মুখে কথা ফুটলো

তবুও ফেরাউনের মনে দয়া ফুটলো না!

পাষাণের দল এবার মায়ের শেষ মানিক– দুগ্ধপোষ্য নবজাতকটিকে ধরে নিয়ে গেলো! ও তখন হাসিমুখে বুকের দুধ খাচ্ছিলো। কী ঘটে চলেছে– কী-ইবা তার বোঝে সে! কিন্তু যখন পাষাণেরা হেঁচকা টান দিয়ে ওকে নিয়ে গেলো তখন তার বিলাপ, তার 'শিশুকান্না' আকাশ-বাতাস ভারি করে তুললো! আর্তধ্বনি বেরিয়ে এলো মায়ের বিচ্ছেদ-জর্জরিত ও বেদনা-প্লাবিত হৃদয় থেকে!

আল্লাহ যখন দেখলেন মায়ের বিচ্ছেদ-পীড়া ও সন্তানহারা বেদনার অসীম ব্যাকুলতা, তখন বুঝি ঢেউ উঠলো তাঁর কুদরতের সাগরেও! তিনি তখন ঐ ছোট্ট নবজাতকের মুখেই ভাষা দান করলেন! কথা ফুটিয়ে দিলেন! নবজাতক মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো–

يا أماه اصبري فإنك على الحق

'মা! সবর করো! তুমি তো সত্যের উপর রয়েছো!'

এতোটুকু বলার পরই সে আবার নির্বাক শিশু হয়ে গেলো!

তার আরেকটু পরই সে তলিয়ে গেলো গরম তেলে!

তখন ওর মুখে লেগেছিলো মায়ের বুকের দুধের সাদা চিহ্ন!

হাতে ধরা ছিলো মায়ের মাথার কয়েকটি কেশ!

গায়ের জামাটা সিক্ত ছিলো মায়ের তপ্তাশ্রুর বেদনাধারায়!

তার আরেকটু পরই ভেসে উঠলো তার গলিত সাদা হাড্ডি!

এভাবেই মায়ের চোখের সামনে শেষ হয়ে গেলো–

কাকলীমুখর একটি বাগানে যেনো ঝড় বয়ে গেলো!

আর সব নীরব হয়ে গেলো!

পাখি নেই, কূজনও নেই।

বৃক্ষ নেই, ফুলও নেই!

কোকিল নেই, গানও নেই!

নেই কোনো স্পন্দন!

সারা দিনমান আর কখনো ওরা মাকে 'মা' ডাকবে না!

এটা-ওটার মিষ্টি বায়না নিয়ে আঁচলে ঝুলবে না!

এখন তারা অন্যলোকের বাসিন্দা!

শহিদীলোকের গর্ব তারা।

শাহাদতের আকাশের ছোট ছোট নক্ষত্র তারা!

এখন কী আছে তাদের? কিছুই নেই!

আর ঐ যে আছে শুধু হাড্ডিগুলো,

সাদা সাদা কচি হাড্ডিগুলো,

টগবগে তেলের উপরে যা ভাসছে, আবার ডুবছে।

আবার ভাসছে আবার ডুবছে।

অসহায় অবলা নারী শুধু তা দেখে আর অশ্রু ঝরায়।

অশ্রু ছাড়া তাঁর আর আছেই বা কী?

আহ! তিনি তো মা! কেমনে সইবেন মা?

কেমনে আর তাকিয়ে থাকবেন এই হাড্ডিগুলোর দিকে?

কার হাড্ডি এগুলো?

এগুলো তাঁর মানিকদের হাড্ডি!

যারা গৃহ মাতিয়ে রাখতো কোলাহল করে করে!

তাঁর কোল জুড়ে বইতো তখন আনন্দের ফল্গুধারা!

হাসি-আনন্দে আর সুখ-উল্লাসে–
কেটে যেতো দিনমান সারাবেলা!
কখনো যদি কেঁদেছে তারা,
আহ! তখন মায়ের কী যে মমতা!
আদর দিয়ে, স্নেহ দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে,
আর মন ভোলানো সান্ত্বনা দিয়ে ভুলিয়ে দিতেন–
সব গাল ফোলানো, চোখ ঝরানো ছোট ছোট দুঃখ-ব্যথা!
বায়না ধরার সেই রঙিন দিনগুলো আর আসবে না!
আর আসবে না উৎসব-আনন্দে নতুন পোষাকের মজা-লুটা!
এরা সে সব থেকে এখন দূরে, বহু দূরে।

একটু পরই আসছে তাঁরও পালা!
এই ভালো!
যে পথে কুরবান হয়েছে বুকের ধন,
সে পথেই যেতে চান তিনি!
অথচ ইচ্ছে করলে এখন বেঁচে যেতে পারেন তিনি!
শুধু কি তাই?
বাঁচাতে পারতেন ঐ পাঁচ শিশুকেও তিনি।
শুধু একটি কথা উচ্চারণ করে!
ফেরাউনকে শুনিয়ে একটি কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে!
কিন্তু সে যে মানা!
ঈমানের ফুলবাগানে প্রবেশ করে–
কে ফিরে যেতে চায় কুফরের কাঁটাবনে?
ফেরাউনের কাছে কী আছে, আঁধার ছাড়া?
কাঁটা ছাড়া?

অথচ আল্লাহর কাছে আছে–

শুধু আলো আর আলো!

শুধু শান্তি আর শান্তি!

শুধু প্রাপ্তি আর প্রাপ্তি!

যার সবকিছুর শিরোনাম–

জান্নাত! জান্নাত!! জান্নাত!!!

•

এর পরে কী ঘটলো? এর পর যা ঘটলো তা মোটেই অপ্রত্যাশিত ছিলো না। হিংস্র শিকারী কুত্তার ন্যায় সৈন্যরা তাঁর দিকে ধেয়ে এলো এবং তাঁকে ধরে নিয়ে গেলো– তপ্ত তেলের হাড়ির দিকে! এক্ষুণি তাঁকে নিক্ষেপ করা হবে সেখানে। তিনি তাকালেন– অগ্নিময় হাড়িটিতে ভাসমান পাঁচ সন্তানের হাড্ডিগুলোর দিকে। তখন তাঁর মনে একটি বাসনা জাগলো। তাকালেন তিনি ফেরাউনের দিকে। বললেন–

'তোমার কাছে আমার একটা শেষ চাওয়া আছে!'

ফেরাউন চীৎকার করে উঠলো–

'তুমি আবার কী চাও?'

তিনি বললেন–

'আমার এবং আমার সন্তানদের হাড় জড়ো করে একটা কবরে তুমি একসাথে আমাদেরকে দাফন করবে!'

এরপর তাঁকে ছুঁড়ে মারা হলো হাড়িতে– টগবগে তেলে! পুড়ে গেলো সারা দেহ! বেরিয়ে গেলো তাঁর প্রশান্ত আত্মা! চলে গেলো আল্লাহর কাছে! এখানে পড়ে থাকলো শুধু তাঁর নিষ্প্রাণ হাড্ডি!

হে মহিয়সী! বৃথা যায় নি তোমার কুরবানী!

সত্যি তাঁর অটলতা মহান! নিঃসন্দেহে তাঁর পুরস্কারও আল্লাহর কাছে অপরিমেয়।

মি'রাজ রজনীতে আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুটা দেখেও এসেছেন তাঁর পুরস্কারের নমুনা! এসে জানিয়েছেন তাঁর সাহাবীগণকে। লক্ষ্য করো ইমাম বায়হাকী'র বর্ণনা–

لما أسري بي مرت بي رائحة طيبة .. فقلت: ما هذه الرائحة ؟ فقيل لي : هذه ماشطة بنت فرعون وأولادُها ..

'মি'রাজ রজনীতে আমি একটা সুঘ্রাণ পেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম– এই সুঘ্রাণ কিসের? তখন আমাকে বলা হলো– এ হলো ফেরাউন কন্যার কেশবিন্যাসকারিণী এবং তার সন্তানদের সুঘ্রাণ।'

আল্লাহ আকবার! শাস্তি সামান্য, পুরস্কার কী অসামান্য! দুনিয়াতে তিনি ছিলেন ফেরাউনের প্রাসাদে। আশা করা যায় এখন তিনি জান্নাতের বালাখানায় পরম তৃপ্ত– জান্নাতের অপরিমেয় নাজ-নেয়ামতে পরম সুখী! এবং অবশ্যই সাথে আছে তাঁর আদরের মানিকরা!

ইমাম বোখারী রহ. বর্ণনা করেন, আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

لو أنَّ امْرأة من أهلِ الجنَّة اطَّلعَتْ إلى أهلِ الأرضِ لأضاءتْ ما بينهما ولملأته ريحاً .. ولنصيفُها على رأسِها خير من الدنيا وما فيها .

'জান্নাতবাসিনীদের কেউ যদি দুনিয়াতে একটু উঁকি দিতো, তাহলে সারা দুনিয়া আলোর আলোয় ভরে যেতো! পূর্ণ হয়ে যেতো সুঘ্রাণে! ওদের মাথার অবগুণ্ঠণ দুনিয়া এবং দুনিয়ার তাবৎ বস্তু থেকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম।'

ইমাম মুসলিম রহ.-এর বর্ণনা–

তাকে শাস্তি দেয়া হবে। জান্নাতের নাজ-নেয়ামত থেকে থাকবে সে চিরবঞ্চিত। তাকে পান করানো হবে জাহান্নামের গরম পানি।

ইমাম যাহাবী বলেছেন– নামাজ তরক করা কবীরা গোনাহ্।

এক মহিলার ঘটনা। মারা যাওয়ার পর তার ভাই তাকে দাফন করে বাড়ি ফিরে গেলো। ভুলে ভাইটি বোনের কবরে টাকার একটি থলে ফেলে গেলো। বাড়িতে গিয়ে যখন তার মনে পড়লো সাথে সাথে ছুটে এলো সে কবরে। মাটি খুঁড়তে লাগলো সে কবরের। কিন্তু মাটি সরে যেতেই দেখা গেলো কবরের ভিতরে দাউ দাউ আগুন! ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ভাইটি তাড়াতাড়ি ফের মাটিচাপা দিয়ে কবরের মুখ বন্ধ করে দিলো। ফিরে এলো তার মায়ের কাছে– কাঁদতে কাঁদতে, ভয়-থরথর শরীরে। এসে বললো –

'মা! আমাকে বলো তো, আমার বোন জীবদ্দশায় কী করতো?'

মা একটু অবাক হয়েই বললেন–

'হঠাৎ এই প্রশ্ন?'

ছেলেটি বললো–

'মা! আমি তার কবরে আগুন জ্বলতে দেখেছি! দাউ দাউ আগুন!'

মা তখন চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বললেন–

'তোর বোন নামাজে অবহেলা করতো। নির্দ্ধারিত সময় পার হয়ে গেলে বিলম্বে নামাজ পড়তো!'

বোন আমার!

নামাজে অবহেলা করার এই হলো পরিণাম।

আমরা যে সূর্যোদয়ের পরে নামাজ পড়ি কিংবা অন্যান্য নামাজ যে সময়ের অনেক পরে পড়ি, এ কিন্তু ভয়ঙ্কর অন্যায়। এখন বলো, যারা একদম নামাজই পড়ে না, তাদের শাস্তি কতো ভয়ানক হবে?

আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ যারা কাজা করে তাদের শাস্তি সম্পর্কে বলেছেন–

'রাতে আমার কাছে দু'জন ফেরেশতা এলো। ওরা আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বললো– 'চলুন!' আমি তাদের সাথে চলতে লাগলাম। এক

জায়গায় এসে দেখতে পেলাম এক ব্যক্তি শুয়ে আছে। পাশেই পাথর হাতে এক ফেরেশতা দাঁড়ানো। ফেরেশতা যখন পাথর দিয়ে তার মাথায় আঘাত করছে তখন তা একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। পাথরটা গিয়ে ছিটকে পড়ছে অনেক দূরে। ফেরেশতা পুনরায় শাস্তি দিতে পাথরটা যখন পুনরায় আনতে যাচ্ছে, তার মাথাটা আবার ভালো হয়ে যাচ্ছে আগের মতো। আবার সেই পাথর দিয়ে ফেরেশতা আগের মতো তার মাথায় আঘাত করছে। আমি বললাম– 'এ কী?' ফেরেশতাদ্বয় আমাকে জানালো যে এই লোক কুরআন নিয়ে (শিখে) তা প্রত্যাখ্যান করতো (কুরআন শিখে সে অনুযায়ী আমল করতো না)। এবং নামাজের সময় নামাজ না পড়ে ঘুমিয়ে থাকতো।'

كذلك العذاب ولعذاب الأخرة أكبر لو كانوا يعلمون

'এমনই হবে শাস্তি। আখেরাতের শাস্তি সবচে' বড় শাস্তি। যদি তারা জানতো!'

রানী

চেনো রানীকে?

সত্যি তিনি রানী ছিলেন আপন সিংহাসনে!

ছিলো তাঁর সাজানো পরিবার।

ছিলো তাঁর রাজকীয় উপায়-উপকরণ ও সুবিন্যস্ত নিদমহল!

তাঁর সেবায় সদা প্রস্তুত থাকতো দলে দলে সেবিকা।

সশ্রদ্ধ সালাম ও কূর্নিশে সদা থাকতেন তিনি সম্মান-আপ্লুত!

কিন্তু তিনি শুধু প্রাসাদ ও মাল-দৌলতের রানীই ছিলেন না, ছিলেন তিনি ঈমানের মহা দৌলতের রানীও। তবে তাঁর ঈমান ছিলো– গোপন। কে তিনি? তিনি ফেরাউনের স্ত্রী– বিবি আসিয়া! 'পালকপুত্র' মূসা যখন নবী হলেন তখন গোপনে গোপনে তিনি তাঁর প্রতি ঈমান নিয়ে এলেন!

বিবি আসিয়ার কী ছিলো না? সবই ছিলো। সুখ ছিলো। আনন্দ ছিলো। ছিলো অঢেল নেয়ামত। কিন্তু এ-সবে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। যখন তিনি

দেখলেন– শহিদী কাফেলা ঊর্ধ্বজগতের সফরে প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যাচ্ছে– একের পর এক, তখন তিনি তাঁর নকল সিংহাসনের কথা ভুলে গেলেন। আসল সিংহাসনে আরোহণের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি নিজের ঈমানের ঘোষণা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। লালায়িত হয়ে উঠলেন প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যেতে। ফেরাউনের পড়শ তাঁর আর ভালো লাগছে না। অসহ্য লাগছে।

ফেরাউন যখন ঈমান আনার কারণে কেশবিন্যাসকারিণী মহিলাকে হত্যা করলো তখন বিবি আসিয়া আর সইতে পারলেন না, ফেরাউনের কঠোর সমালোচনায় অবতীর্ণ হলেন। ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে চীৎকার করে উঠলেন–

'তোমার ধ্বংস হোক! কোন্ সাহসে তুমি আল্লাহর উপর দুঃসাহস দেখাচ্ছো?'

এরপর ফেরাউনের সামনে দাঁড়িয়েই ঈমানের ঘোষণা দিলেন তিনি। ফেরাউনের মাথায় যেনো আকাশটা ভেঙে পড়লো। স্ত্রীর বিরুদ্ধেও তখন সে জ্বলে উঠলো। হুঙ্কার ছেড়ে বললো–

'তোমার সামনে দু'টি পথ। হয় আল্লাহকে অস্বীকার করবে নয় মৃত্যুর জন্যে তৈরী থাকবে।'

ফেরাউন আর দেরী করলো না। তৎক্ষণাৎ তাঁকে একটা লোহার পাতে হাত-পা ছড়িয়ে দাঁড় করানোর নির্দেশ দিলো। একটু পরই সেই লোহার পাতের সঙ্গে তাঁর হাতে-পায়ে লোহার পেরেক মারা হলো। নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। আছে শুধু দুঃসহ বেদনা। এরপর ফেরাউনের পক্ষ থেকে নির্দেশ এলো– 'বেত্রাঘাত'।

শুরু হলো অমানবিক নিষ্ঠুরতায় এক নারীর উপর এক জালিম বাদশাহর লোমহর্ষক অত্যাচার। ক্ষত-বিক্ষত হতে লাগলো নারীদেহ। ঝরতে লাগলো টপটপ তাজা রক্ত। খসে খসে পড়তে লাগলো হাড্ডি থেকে দলাদলা গোশত।

জুলুম যখন নিষ্ঠুরতার সকল মাত্রাই ছাড়িয়ে গেলো, একটু পরই মৃত্যু যখন অনিবার্য হয়ে উঠলো, তখন মহিয়সী আসিয়া তাকালেন আকাশের দিকে! বললেন বিড়বিড় করে –

رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ .

'হে আমার রব! তোমার পড়শে আমার জন্যে একটি গৃহ 'সাজাও'! আমাকে উদ্ধার করো ফেরাউন এবং তার দুস্কৃতি হতে। আমাকে উদ্ধার করো অত্যাচারী সম্প্রদায় থেকে।'

অমন বেদনাঘেরা হৃদয়ের প্রার্থনা .. জালিম কর্তৃক এমন দলিত মথিত হৃদয়ের প্রার্থনা কি কবুল না হয়ে পারে? সরাসরি আল্লাহ্র আরশকে গিয়ে স্পর্শ করলো তাঁর এ প্রার্থনা। প্রখ্যাত তাফসীরকার আল্লামা ইবনে কাসীর বলেন–

'আল্লাহ সাথে সাথে তাঁর প্রার্থনা কবুল করলেন এবং জান্নাতে নির্মিত হওয়া সেই বাড়িটিও তাঁর চোখের সামনে তুলে ধরলেন! তা দেখার পর বিবি আসিয়ার চোখে-মুখে মিষ্টি হাসির উল্লাস ছড়িয়ে পড়লো এবং তিনি আল্লাহ্র কাছে চলে গেলেন!'

হ্যাঁ, রানী চলে গেলেন! শাহাদতের লাল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে। হাসতে হাসতে! দুনিয়ায় বসেই জান্নাতের ঠিকানা চোখের সামনে ভেসে উঠলে– কে না আনন্দে মাতোয়ারা হয়? ফেরাউনরূপী জালিমদের জুলুম-দণ্ডকে তখন আর দণ্ড মনে হয় না, মনে হয় গোলাপের কোমল আঁচড়! অপরদিকে শোবান-ছড়ানো সুখ-আনন্দকেও মনে হয়– পথের কাঁটা!

সবই ছেড়ে গেলেন। তাঁর ফুলে ফুলে সুরভিত উদ্যান, সেবিকাদের কোলাহলময় আনাগোনা, সখী ও বান্ধবীদের সরু চোখের আঁচলচাপা হাস্য-কৌতুক। সব ছেড়ে বেছে নিলেন তিনি মৃত্যুকে। গৌরবের মৃত্যুকে। শহিদী মৃত্যু তো গৌরবের মৃত্যুই!

আজ সুখের মাঝে তাঁর নিত্য বসবাস। সে সুখের কোনো তুলনা চলে না। জান্নাতী সুখ কি তুলনীয়? আল্লাহ্র পথে জীবন বিলিয়ে দিলে এমন পুরস্কারই মিলে! তখন দুনিয়ায় বসেই দেখা যায় জান্নাতের ছবি ও রূপছায়া! জান্নাতের কোন্খানে হবে আবাস ও ঠিকানা– তাও তখন এ দুনিয়াতে বসেই প্রত্যক্ষ করা যায়!

ধন্য তুমি হে মহিয়সী!

ধন্য তোমার জীবনদান!

প্রবৃত্তিকে জয় করে আখেরাতের বাগান সাজানোর যে শিক্ষা তুমি দিয়ে গেলে নারী জাতিকে– তা কি তারা গ্রহণ করবে?

ইয়াকুত খচিত মোতির বাড়ি!!

রানী আসিয়া আর নেই! কিন্তু তাঁর আদর্শ– নারী জাতিকে আলোকিত করে যাচ্ছে– ইতিহাসের বিভিন্ন বাঁকে বাঁকে। আমরা এখন এমনই আরেক মহিয়সীর কাছে নিয়ে যাবো তোমাকে। যদি রানী আসিয়া থেকে শিক্ষা নাও, তাহলে তোমার জন্যে এখানেও আছে শিক্ষা।

ইমাম বোখারী রহ.-এর ভাষ্য মতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওত প্রাপ্তির কিছুকাল পূর্ব থেকে হেরাগুহায় যাওয়া-আসা করতেন। সেখানে তিনি আল্লাহর ইবাদতে সময় কাটাতেন। আল্লাহর ধ্যান-সাধনায় নিরত থাকতেন। একদিন ধ্যান-সাধনা আর ইবাদত-মগ্নতার পর তিনি কিছুটা ক্লান্তি অনুভব করছিলেন। মাথার নীচে হাতটা রেখে শুয়ে পড়লেন। তিনি শুয়েছিলেন গুহার নীরব শান্ত পরিবেশে। হঠাৎ হেরাগুহায় তাঁর কাছে আগমন করলেন স্বর্গীয় দূত জিবরীল আমীন। এসে তিনি বললেন–

'পড়ুন!'

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভীত কণ্ঠে জবাব দিলেন–

'আমি কখনো কোনো কিতাব পড়ি নি। আমি পড়তে পারি না, লিখতে পারি না।'

জিবরীল আমীন তখন তাঁকে ধরে বুকে মেশালেন। মৃদু চাপ দিলেন। ছেড়ে দিয়ে বললেন–

'পড়ুন!'

নবীজী পেরেশান হয়ে বললেন–

'কী পড়বো? আমি তো পড়া পারি না!'

আবার জিবরীল আমীন তাঁকে ধরে চাপ দিলেন। এবার আরো জোরে। আবার শোনা গেলো জিবরীল আমীনের কণ্ঠ–

'পড়ুন!'

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার বললেন –

'কী পড়বো?'

এবার আর কোনো চাপ নয়। উচ্চারিত হলো আসমানী দূতের কণ্ঠে–

> اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.
>
> 'পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাটবাধা রক্ত (আঁঠালো বস্তু) থেকে। পড়ো। তোমার প্রভু বড়ো দয়ালু। যিনি মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন কলমের সাহায্যে। মানুষকে জানিয়েছেন সে কথা যা সে জানতো না।'

এ-আয়াতগুলো শুনে এবং এ-দৃশ্য দেখে নবীজীর ভয় আরো বেড়ে গেলো। থরোথরো মনে তিনি ছুটে গেলেন গৃহে। খাদিজার কাছে। এসেই বললেন তাঁকে–

'খাদিজা! আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও! আমাকে তাড়াতাড়ি চাদর দিয়ে ঢেকে দাও!'

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ-কথা বলে শুয়ে পড়লেন। হযরত খাদিজা তাড়াতাড়ি তাঁকে ঢেকে দিলেন। খাদিজা খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন। তিনি উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

একটু পর যখন আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভয় কিছুটা দূর হলো এবং তিনি শান্ত হলেন তখন তিনি খাদিজাকে সব ঘটনা খুলে বললেন। আরো বললেন– 'খাদিজা! আমার খুব ভয় হচ্ছে!'

খাদিজা তখন দৃঢ় কণ্ঠে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন–

كلا .. والله لا يخزيك الله أبداً .. إنك لتصل الرحم
وتقري الضيف .. وتحمل الكل .. وتكسب المعدوم ..
وتعين على نوائب الحق ..

'আল্লাহর কসম! আল্লাহ কখনো আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো সদা সত্য বলেন! আত্মীয়দের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখেন! বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করেন!'

হযরত খাদিজার এই যে সান্ত্বনা ও সাহসী ভূমিকা- তা কখনো বিচ্ছিন্ন হয় নি। সব সময় তিনি নবীজীর পাশে ছিলেন ছায়া হয়ে। সান্ত্বনার দরকার হয়েছে, সান্ত্বনা দিয়েছেন। সহযোগিতার দরকার হয়েছে, সহযোগিতা দিয়েছেন। এমনকি নিজের সবকিছু নবীজীর পায়ে ঢেলে দিয়েছেন।

আল্লাহর রাসূল একটু প্রকৃতস্থ হতেই তিনি হাত ধরে তাঁকে নিয়ে গেলেন চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফল-এর কাছে। তখন ওয়ারাকার অনেক বয়স হয়ে পড়েছিলো। দৃষ্টিশক্তিও লোপ পেয়েছিলো। জাহেলী যুগে তিনি ঈসা আলাইহিস সালামের ধর্মের উপর ঈমান আনেন। তিনি ইঞ্জিলের বোদ্ধা পাঠক ছিলেন। পূর্ববর্তী অনেক নবী-রাসূলের কথা তিনি জানতেন এই ইঞ্জিলের মাধ্যমে। হযরত খাদিজা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে তাঁর খিদমতে হাজির হয়ে বললেন-

يا ابن عم ! اسمع من ابن أخيك ..

'ভাই! শুনুন আপনার ভাতিজা কী বলে।'

ওয়ারাকা তখন তাঁকে জিজ্ঞেসা করলেন-

'ভাতিজা! তুমি কী দেখেছো?'

তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেরাগুহায় যা দেখেছেন এবং যা শুনছেন, একে একে সব বললেন। সব শুনে ওয়ারাকা খুশিতে-আনন্দে-উত্তেজনায় বলে উঠলেন-

'মহিমময় আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো! আবারো বলছি, সুসংবাদ গ্রহণ করো! ইনিই সেই নামূস, যিনি মূসা

আলাইহিস সালামের কাছেও আসতেন!'

এরপর ওয়ারাকা আক্ষেপভরা কণ্ঠে বললেন–

'হায়! যেদিন তোমার কওম তোমাকে বের করে দেবে, সেদিন যদি আমি জীবিত থাকতাম, তাহলে তোমাকে জোরদার সাহায্য করতাম!'

ওয়ারাকার এমন আশঙ্কার কথা শুনে নবীজী অবাক হয়ে বললেন–

'কী বলছেন! আমার কওম আমাকে বের করে দেবে?!'

ওয়ারাকা বললেন–

'হ্যাঁ, তোমার কাছে আল্লাহর যে বাণী এসেছে, এ বাণী যাঁর কাছেই আসে তাঁর সাথেই শত্রুতা করা হয়, দুর্ব্যবহার করা হয়!'

এরপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদিজার সাথে বেরিয়ে গেলেন। হযরত খাদিজা নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পারলেন যে, ঘুমের দিন .. আরামের দিন শেষ। অচিরেই তাঁকেও স্বামীর সাথে কষ্ট শিকারের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। হতে হবে গৃহছাড়া। সইতে হবে জুলুম-নিপীড়ন।

ধনবতী, বংশবতী হয়েও খাদিজাকে আজ এমন করে ভাবতে হচ্ছে। বিস্তৃত পরিসরে ছড়ানো ব্যবসা-বাণিজ্যের মালিকান হয়েও তাঁকে আজ ভাবতে হচ্ছে– ত্যাগের কথা, কুরবানীর কথা, সত্যের পথে কষ্ট-ক্লেশ ও যাতনা সহ্য করার কথা।

যদি আসে সেই কঠিন দিন আর তা তো আসবেই, তাহলে কি তিনি দীনকে সাহায্য করতে পিছপা হবেন? তাঁর ঈমান ও ইয়াকিনে কি চিড় ধরবে? হতেই পারে না! অসম্ভব! তিনি তো ঈমান এনেছেন তাঁর রব-এর প্রতি ঈমানের যে কোনো দাবি পূরণের জন্যেই! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জান দিয়ে, মাল দিয়ে, চেষ্টা দিয়ে সহযোগিতা করার জন্যেই!

এই ছিলো হযরত খাদিজার চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-জ্ঞান– একেবারে সারাটি জীবন। মৃত্যু পর্যন্ত।

মুসলিম শরীফের বর্ণনা–

আল্লাহ্‌র নবীর কাছে আগমন করলেন হযরত জিবরীল আমীন। নবীজীকে তিনি বললেন–

'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই যে খাদিজা আসছেন একটা পাত্র নিয়ে, যাতে আছে তরকারী, খাবার এবং পানীয়। তিনি আপনার কাছে আসলেই আপনি তাঁকে তাঁর রব-এর পক্ষ থেকে সালাম বলবেন। আমার পক্ষ থেকেও। আর তাঁকে সুসংবাদ দেবেন– জান্নাতে তাঁর জন্যে থাকবে একটি 'ইয়াকুত খচিত মোতির বাড়ি'! যেখানে থাকবে না কোনো কোলাহল ও ক্লান্তিবোধ।'

এতোক্ষণ শুনলে তুমি বিবি খাদিজার খবর। মূর্তিপূজা প্রত্যাখ্যান করে সর্ব প্রথম ইসলাম করেছেন কে? তিনি বিবি খাদিজা! ইতিহাস শুধু তাঁর জন্যেই এ আসনটি সংরক্ষণ করে রেখেছে। এ ক্ষেত্রে পুরুষেরা তাঁর পেছনে। বীর-মহাবীররাও তাঁর পেছনে। ইতিহাসকে আলোকিত করে রেখেছে তাঁর ত্যাগ ও কুরবানীর কাহিনী। 'আবু তালেব ঘাটি'-এর অমানবিক অবরোধে মহিয়সী খাদিজা নিজেও আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলেন। আর সেখানকার যে কষ্ট ও ক্লেশের কথা ইতিহাসে লেখা আছে, তা পড়লে চোখে শুধু পানি আসে না, রক্তও আসতে চায়। বিবি খাদিজা অম্লান বদনে মেনে নিয়েছিলেন অবরোধকালীন সময়ের সকল কষ্ট-ক্লেশ। আল্লাহ্‌র পথে যে কোনো কষ্ট-স্বীকারে তিনি ছিলেন সদা প্রস্তুত । কোনো মানুষ তাঁকে অপমান করবে– এ ভয় তাঁকে শঙ্কিত করে নি। কোনো পাপাচারী তাঁর চরিত্র হননের অপচেষ্টায় লিপ্ত হবে– এ ভয়ও তাঁর চলার পথে কাঁটা ছড়াতে পারে নি।

ফলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিনিময়ও লাভ করেছেন তিনি অপরিমেয়। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তাঁর জন্যে জান্নাতের অফুরন্ত মেহমানদারী ও আতিথেয়তার। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসেছে তাঁর কাছে সালাম ও সুসংবাদ– জান্নাতী বাড়ির!!

এমন প্রাপ্তিতে কে না আপ্লুত হয়?

এমন সুসংবাদে কার না হৃদয়ে বান ডেকে যায় সুখ-আনন্দের?

এ প্রাপ্তি ও সুসংবাদের পর তাঁর শোকর ও ইবাদত আরো বেড়ে গিয়েছিলো। ঈমানের সকল স্তর পার হয়ে তিনি পৌছে গিয়েছিলেন পরিপূর্ণতার ঘরে। ঈমানের কামেল মারহালায়। আল্লাহ্‌র কাছে চলে না

যাওয়া পর্যন্ত চলছিলো তাঁর এ সাধনা– পূর্ণ মহিমায়। আল্লাহ যখন তাঁকে ডেকে পাঠালেন, তখন তাঁর বিরহ-বিচ্ছেদ শুধু উম্মতকে কাঁদায় নি, শুধু আকাশ-পৃথিবীকে কাঁদায় নি, কাঁদিয়েছে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মন-মানসকেও। তাই তাঁর ওফাতের বছরটা তাঁর কাছে ছিলো 'দুঃখের বছর'।

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

'আল্লাহ মু'মিন নর-নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের –যার তলদেশে ঝরনাসমূহ প্রবাহিত হবে, যেখানে তারা স্থায়ী হবে– এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসস্থানের। আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তাই মহা সাফল্য।'

নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের আম্মাজান হযরত খাদিজাকেও দেবেন এ মর্যাদা। কেননা, তিনি তো তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট! তাহলে তাঁর মেয়েরা কেনো তাঁর অনুসরণ করে ধন্য হবে না?

হে আমার বোন!

কেনো তুমি তাঁর আনুগত্যকে নিজের গর্ব ও অহঙ্কারের বস্তু মনে করবে না? চাও না– তোমার জন্যেও জান্নাতে তৈরী হোক একটা বাগানবাড়ি! একটা 'জোনাকজ্বলা বাঁশবাড়ি'! ইয়াকুতখচিত একটা মুক্তার বাড়ি? যেখানে থাকবে না বিরক্তিকর কোলাহল আর ক্লান্তি অবসাদ? তাহলে খাদিজার আদর্শকে নিজের আদর্শ বানাও! তাঁর পতিপ্রেমকে তুমি নবীপ্রেম বানাও! তাঁর আদর্শের পথে চলাকে তুমি নিজের কণ্ঠহার বানাও!

সর্বশেষ আঘাত!!

উম্মে আম্মার সুমাইয়া ছিলেন আবু জেহেলের অধিনস্ত দাসী। ইসলামের কথা যখন তাঁর কানে এলো, তখন তিনি, তাঁর ছেলে এবং তাঁর স্বামী

ইসলাম কবুল করে ধন্য হন। এ কথা যখন জানতে পারলো আবু জেহেল, তখন তাঁদের উপর নেমে এলো লোমহর্ষক শাস্তি। অমানবিক শাস্তি। তাঁদেরকে বেঁধে রাখা হলো প্রচণ্ড সূর্যতাপে। তারপর বেত্রাঘাত আর বেত্রাঘাত। গরমের প্রচণ্ডতায় এবং পিপাসার তীব্রতায় প্রাণ তাঁদের ওষ্ঠাগত। লবেজান অবস্থা।

আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের পাশ দিয়ে যেতেন আর দেখতেন তাঁদের শরীর থেকে টপটপ রক্ত ঝরছে। গরমে-পিপাসায় তাঁরা ছটফট করছে। নির্দয় নিষ্ঠুর বেত্রাঘাতের কারণে শরীরের ঘা গুলো দগদগ করছে। আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ-সব দেখতেন আর ব্যথিত হতেন। তাঁদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে বলতেন–

صبراً آل ياسر .. صبراً آل ياسر .. فإن موعدكم الجنة

'হে ইয়াসির পরিবার! ধৈর্য ধরো! জান্নাতই তোমাদের ঠিকানা!'

স্বয়ং আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পক্ষ থেকে এমন মহা সুসংবাদ শুনে ইয়াসির পরিবার-এর হৃদয়-মন আনন্দে-পুলকে দুলতে থাকে। ভুলে যায় তাঁরা নিজেদের দেহের দগদগে ক্ষতের কথা। নিষ্ঠুর জল্লাদদের বেত্রাঘাতের কথা।

হঠাৎ করে সেখানে আসে আবু জেহেল। আজ শয়তানটা ইয়াসির পরিবারের উপর আরো বেশী ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত। শাস্তি ও জুলুমের মাত্রা সে আরো বাড়িয়ে দেয়। বলে–

'মুহাম্মদকে গালি দাও, দিতে হবে! নইলে তোমাদের শাস্তি জারি থাকবে।'

কিন্তু ইয়াসির পরিবার ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে নরাধম আবু জেহেলের কথা। তাঁদের ঈমান ইয়াকিন আরো বেড়ে যায়।

শয়তানটা এক পর্যায়ে এগিয়ে যায় সুমাইয়ার দিকে। আস্তে আস্তে তাক করে বর্শাটা! হঠাৎ ছুঁড়ে মারে তা বিবি সুমাইয়ার লজ্জাস্থানে!! ... তাজা রক্তের দরিয়া!! সুমাইয়ার চীৎকারে-আর্তনাদে কেঁপে উঠে মক্কা-মক্কার আকাশ-বাতাস!! সবকিছু! স্বামী ও ছেলে পাশেই। কিছুই করার ছিলো না তাঁদের। তাঁরা যে বন্দি! হাত-পা তাঁদের বাঁধা। তাই নীরবেই

ওদেরকে দেখতে হলো নারীর প্রতি এক নরপশুর নিষ্ঠুর বর্বরতা!! আবু জেহেল তাঁকে গালি দেয়। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দিতে বলে। আর বিবি সুমাইয়া রক্তভেজা দেহ নিয়ে মৃত্যুর প্রহর গোনতে গোনতে বলে যান– আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!! এক সময় বর্শাঘাতে রক্তক্ষরণে নিস্তেজ হয়ে আসে তাঁর দেহ। নিটবর্তী হয়ে আসে শাহাদতের কাঙ্ক্ষিত লগ্ন!! হঠাৎ তিনি লুটিয়ে পড়েন শাহাদতের লাল বিছানায়!!

হ্যাঁ, তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন।

কিন্তু কী সুন্দর তাঁর মত্যু!

মৃত্যুকে যখন আলিঙ্গন করেন তিনি, তখন তাঁর রব তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। কেননা তিনি ছিলেন দ্বীনের উপর অটল-অবিচল ও বিশ্বস্ত। তিনি মৃত্যুর কোলে বসে বসে হেসেছেন, তবুও পরোয়া করেন নি জল্লাদের চাবুক। কুফরের 'ইমাম'দের কোনো প্রলোভনও পারে নি তাঁর ঈমানের কুসুম-কাননে আবর্জনা ফেলতে।

কিন্তু বেদনায় নীল হয়ে যেতে হয়, যখন দেখি– বর্তমান যুগের তরুণী ও যুবতীরা অল্পতেই পথ হারিয়ে বসে। সামান্য থেকে অতি সামান্য প্রলোভনের জালে আটকা পড়ে বিকিয়ে দেয় নিজেদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও ঈমান-আকিদা। অথচ জুলুম-নির্যাতন তাদেরকে সইতে হয় না। দুশমনের চাবুকের আঘাতে তাদের শরীরও ঝলসে যায় না। কোনো ভয়-ভীতিও তাদেরকে তাড়া করে ফেরে না। নেই তাদের জীবনে বিবি হাজেরা, বিবি আসিয়া ও বিবি সুমাইয়ার ত্যাগ, কষ্ট।

তবুও তারা কেনো দ্বীন থেকে সরে যায়?

কেনো গান শুনে কলুষিত করে নিজেদের কান?

সিনেমা-নাটক দেখে দৃষ্টিকে করে জীবাণুযুক্ত?

প্রেম-ভালোবাসার নামে কেনো ওরা ছুটে চলেছে প্রবৃত্তির পেছনে? একদল মাতাল ও বিকারগ্রস্ত মানুষের যৌন-পিপাসার আগুনে ঘৃতাহুতি দিতে? শরীয়তের অলঙ্ঘনীয় বিধান– হিজাব ও পর্দাকে অপদস্থ করে?

আকাশ তোমায় গান করাবে!!

হ্যাঁ, সোনালী অতীতে আমাদের গর্বিত নারী জাতি অন্যায় ও অসত্যের সাথে কখনো আপোষ করেন নি।

তাঁরা জান দিয়েছেন তবু মান দেন নি।

রক্ত দিয়েছেন তবু ঈমান দেন নি।

নির্যাতন ভোগ করেছেন তবু নতি স্বীকার করেন নি।

তপ্ত লৌহ শলাকার ছ্যাঁকা সয়েছেন,

স্বামী-পুত্রের বিচ্ছেদ মেনে নিয়েছেন,

তবু তাঁদের পবিত্র বিশ্বাস থেকে তিল পরিমাণও সরে আসেন নি।

'আল্লাহ্ আমার রব!'–

এই উচ্চারণে সদা মুখর ও সজীব ছিলো তাঁদের কণ্ঠ।

যখন এসেছে চ্যালেঞ্জ পর্দার সামনে,

তখন তাঁরা বলেছেন নির্ভীক কণ্ঠে–

'না! পর্দা আমি ছাড়বো না! পর্দা আমার অহংকার!'

যখন বিপদ এসেছে তাঁদের ইজ্জত-আব্রুর উপর,

তখন দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছেন তাঁরা–

'জান দেবো তবু মান দেবো না!'

যখন ডাক এসেছে জীবন বিলানোর,

তখন শোনা গেছে তাঁদের আনন্দ বিগলিত কণ্ঠ–

'আমার জীবন তো আমার না! এ জীবনের বিনিময়ে না আমি আল্লাহ্‌র কাছে থেকে জান্নাত খরিদ করেছি!!'

এঁরা নারী জাতির চিরগর্ব। চির অহংকার। চির স্মরণীয় এঁরা। জীবন কেটেছে তাঁদের একই ধ্যান-জ্ঞানে। আর তা হলো– কীভাবে তাঁরা ইসলামের খিদমত করবেন। দ্বীনের তরে বিলিয়ে দেবেন ধন-সম্পদ, সময়-কাল এবং প্রাণ-জীবন।

যখনই তাঁদের কাছে এসেছে সত্যের আহ্বান, 'লাব্বাইক!' বলতে তারা একটুও দেরী করেন নি। তারপর? তারপর সে সত্যের রঙে নিজেদেরকে রাঙাতে এবং ঈমান ও ইয়াকিনের সকল 'তিথি'কে একত্রিত করে ষোলকলায় পূর্ণতা দিতে তাঁদের চেষ্টা-সাধনা আর চিন্তা-ফিকিরের কোনো অভাব ছিলো না।

ইতিহাসের এমন আলোকিত নারীদের কথা এক এক করে আর কতো বলা যায়? যা বলে শেষ করা যায়? সবাই তো ছিলেন তাঁরা যেনো ঐ আকাশের রবি-শশী-গ্রহ-তারা? শোনো আরেকজনের কাহিনী–

কে তিনি? তিনি উম্মে শোরাইক! ইসলাম কবুল করেছিলেন একেবারে সূচনাকালে। নিরাপদ নগরী মক্কায় বসে। যখন দেখলেন তিনি কাফেরদের দাপট ও দৌরাত্ম্য আর পাশাপাশি মুসলমানদের দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব, তখন তিনি আর ঘরে বসে থাকতে পারলেন না। দাওয়াতের গুরুভার তুলে নিলেন নিজের কাঁধে। ঈমানকে করলেন মজবুত ও সুদৃঢ়। তাঁর রব-এর মর্যাদা তাঁর কাছে হয়ে উঠলো সকল কেন্দ্রের বিন্দু। 'সকল নদীর মোহনা'।

গোপনে গোপনে কোরেশ মহিলাদের কাছে গিয়ে তাদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে লাগলেন তিনি। মূর্তিপূজার অসারতা তুলে ধরতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর গোপন দাওয়াতের কথা বেশী দিন গোপন থাকলো না। জেনে গেলো কোরেশ কাফেররা। ফলে জ্বলে উঠলো ওদের নাপাক আত্মারা। উম্মে শোরাইক কোরেশ গোত্রের মহিলা ছিলেন না। তাই তাঁর পাশে এসে কোরেশের কেউ দাঁড়ালো না। কোরেশরা তাঁকে ধরে এনে জিজ্ঞাসা করলো লাল চোখে–

'তোমার সম্প্রদায় যদি আমাদের মিত্র না হতো, তাহলে তোমার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতাম। কিন্তু তোমাকে একেবারে আমরা ছেড়ে দেবো না। অন্যায় তোমার গুরুতর। তোমাকে মক্কা থেকে বের করে দেয়া হবে। তোমাকে ফিরে যেতে হবে স্বজাতির কাছে। মক্কায় তোমার কোনো ঠাঁই নেই।'

এরপর তারা একটা উটের পিঠে তাঁকে তুলে দিলো। জিনবিহীন উট। সামান্য কাপড়ও বিছানোর অনুমতি দিলো না উটের পিঠে। এমন জিনহীন

খালি পিঠে সফর করাটা কতো যে কঠিন তা ভুক্তভুগী ছাড়া আর কেউ জানে না। এমনটি করেছিলো তারা তাঁকে শাস্তি দিতেই। এক মহিলা হয়েও তিনি ওদের কাছে সামান্য এ-মানবিক করুণাটুকুও পেলেন না।

যাই হোক: শুরু হলো উটের মরু সফর। তিন দিন তারা তাঁকে নিয়ে পথ চললো। এ-তিন দিনে সঙ্গের লোকেরা তাঁকে কিছুই খেতে দিলো না। এককোঁটা পানিও না। ক্ষুৎ-পিপাসায় তাঁর প্রাণ যায় যায় অবস্থা। কাফেররা যখন কোনো লোকালয়ে যাত্রা বিরতি করতো তখন উম্মে শোরাইককে বেঁধে রাখতো। ছায়ার বদলে প্রখর রৌদ্রে ফেলে রাখতো। আর নিজেরা বসতো শীতল ছায়ায়। ছায়াদার বৃক্ষের নীচে।

আরেকদিন এমনিভাবে তারা এক বাড়ির কাছে যাত্রা বিরতি করলো। উম্মে শোরাইককে উট থেকে নামালো। বেঁধে রৌদ্রে ফেলে রাখা হলো। উম্মে শোরাইক একটু পানি চাইলো। তারা 'না!' বলে দিলো। বেসামাল ক্ষুধা ও পিপাসা নিবারণের কোনো উপায় দেখছেন না তিনি। অস্থির হয়ে জিহ্বা চাটতে লাগলেন তিনি। হঠাৎ তিনি অনুভব করলেন যে, বুকের কাছটায় ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। হাত দিয়ে দেখলেন পানিভরা একটা ছোট্ট বালতি সেখানে। অবাক-বিস্ময়ে তিনি সেখান থেকে আঁজলা ভরে পানি নিলেন। তৃপ্তিভরে পান করলেন। আবার নিলেন। আবার পান করলেন। নিয়ে নিয়ে তৃপ্ত হলেন। কী শীতল পানি! কী তার স্বাদ ও মিষ্টতা! কী তার মজা ও মধুরতা! তাঁর ভিতরটা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এবার তিনি বাকী পানিটুকু শরীরে ঢেলে দিলেন। আহা! কী শান্তি! যেনো জান্নাতী ঝর্না থেকে এইমাত্র তিনি নেয়ে উঠলেন।

এদিকে কাফেররা বিশ্রাম শেষে নতুন করে পথচলার জন্যে উঠে দাঁড়ালো। তাঁর কাছে এলো। এসেই দেখলো তাঁর শরীর ও পরিধেয় বস্ত্র পানিভেজা। তাঁকেও দেখে মনে হলো ক্লান্তিহীন, শ্রান্তিহীন ও হৃষ্টপুষ্ট। তারা বেশ অবাক হলো। পানি কী করে এর কাছে এলো। কে দিয়ে গেলো? এ তো বন্দি! তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো—

'এই ঠিক করে বলে তো, তুমি বাঁধন খুলে আমাদের পানি এনে শেষ করে দাও নি তো?'

'হ্যাঁ! কসম আল্লাহর! তবে আকাশ থেকে পানিভরা একটা বালতি নেমে এসেছিলো আমার কাছে। আমি তা থেকেই পান করে করে তৃপ্ত হয়েছি। আর বাকিটা ঢেলে দিয়েছি শরীরে!'

এ কথা শুনে কাফেরদের চোখ বড় হয়ে গেলো– বিস্ময়ে! তারা পরস্পরে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো। আর বললো–

'যদি সে সত্যবাদী হয়, তাহলে তার দ্বীনই তো সেরা ও উত্তম!'

এরপর তারা যাচাই করে দেখলো যে তাদের মশক ঠিক যেমন ছিলো তেমনি আছে। কেউ স্পর্শ করে নি। তারা নিশ্চিত হলো যে, উম্মে শোরাইক যা বলেছে শতভাগ সত্য বলেছে। সাথে সাথে তারা তাঁর কাছে ইসলামের কালেমা পড়ে সেখানেই মুসলমান হয়ে গেলো। সাথে সাথে খুলে দিলো উম্মে শোরাইকের বাঁধন। বদলে গেলো নিমিষেই কঠিন-হৃদয় প্রহরীরা দয়ালু ও অনুগত খাদেমে। এরপর থেকে তারা সকলেই তাঁর সাথে ভীষণ ভালো ব্যবহার করলো।

তাদেরকে একটু আগে যিনি দিয়েছেন আলোর পথের সন্ধান, সত্য পথের দিশা, তাঁর হাতে কি এখন শেকল মানায় না দুর্ব্যবহার তাঁর প্রাপ্য?

পথসঙ্গী সবাই ইসলাম কবুল করলো তাঁর ধৈর্য ও অবিচলতার কারণে। হ্যাঁ, কেয়ামতের দিন যখন উম্মে শোরাইক উত্থিত হবেন, তখন তাঁর হাতের সহীফায় (তালিকায়) থাকবে এমন কিছু নারী-পুরুষের নাম– যাঁরা তাঁর হাতে ইসলাম কবুল করে ধন্য হয়েছিলেন। হাশরের ময়দানে এও তো বিরাট এক পাওয়া! আছে কি উম্মে শোরাইকের কাহিনী ও ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী কোনো বোন?

দেখতে চাও জান্নাতী মহিলা!!

হ্যাঁ, ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে উম্মে শোরাইকের কথা! ইতিহাসে আরো লেখা আছে এমন আরো অনেক মহীয়সী নারীর কথা!! তাঁদের আরেকজন হলেন– গোমাইসা আনাস ইবনে মালেক রা.-এর জননী। যাঁর সম্পর্কে আল্লাহর নবীর ইরশাদ হলো–

دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي فإذا هي الغميصاء بنت ملحان ..

'আমি জান্নাতে প্রবেশ করে শুনতে পেলাম– আমার সামনে একটা খসখসানি, চাইতেই দেখি– আরে, এ যে গোমাইসা বিনতে মালহান!'

এক বিস্ময়কর মহিলা তিনি। জাহেলী যুগে অন্যান্য যুবতীদের মতোই কেটেছে তাঁর জীবন। মালিক ইবনে নজর-এর সাথে তাঁর শাদী হয়েছিলো। ইসলামের আগমনের পর আনসারদের একটি প্রতিনিধিদল ইসলাম কবুল করলে তিনিও তাঁদের সাথে ইসলাম কবুল করেন। তাঁর কুনিয়াত (উপনাম) ছিলো উম্মে সোলাইম। উম্মে সোলাইম ইসলাম গ্রহণের পর স্বামীকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু স্বামী দাওয়াত কবুল করলেন না। উল্টো স্ত্রীর উপর রুষ্ট হয়ে শাম চলে যাওয়ার জন্যে মনস্থির করলেন। তার সাথে উম্মে সোলাইমকেও নিয়ে যেতে চাইলেন। উম্মে সোলাইম রাজি হলেন না। অগত্যা তিনি একাই শাম চলে গেলেন এবং সেখানেই কিছুদিন পর মারা গেলেন।

উম্মে সোলাইম ছিলেন একজন রূপবতী বুদ্ধিমতি মহিলা। তাই তাঁর পাণি গ্রহণের জন্যে পুরুষদের মাঝে রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু হলো। আবু তালহাও তাঁকে বিবাহের পয়গাম দিলেন। তখনো তিনি ইসলাম কবুল করেন নি। উম্মে সোলাইম আবু তালহার পয়গাম ফিরিয়ে দিলেন না, তবে শর্ত দিয়ে বললেন–

'আবু তালহা! আমি রাজি! তোমার মতো মানুষের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিই কী করে? কিন্তু আমি মুসলিম আর তুমি কাফের! তোমাকে ইসলাম কবুল করতে হবে। তাহলেই কেবল এ বিবাহ হতে পারে। হ্যাঁ, আমাকে তোমার কোনো মোহর দিতে হবে না– আলাদা করে। বরং তোমার ইসলাম গ্রহণই মোহর হিসাবে বিবেচিত হবে।'

আবু তালহা বললেন–

'কিন্তু আমিও তো একটি ধর্মের অনুসারী!'

উম্মে সোলাইম জবাবে বললেন–

'দেখো আবু তালহা! তুমি ধর্মের অনুসারী বটে, কিন্তু বাতিল ধর্মের অনুসারী। বলো তো, তোমার উপাস্য কি কাঠের নিষ্প্রাণ টুকরো ছাড়া আর কিছু? যা কেটে কেটে তৈরী করেছে হাবশী গোলাম?'

আবু তালহা উম্মে সোলাইমের কথা অস্বীকার করতে পারলেন না। কেননা তাঁর কথায় যুক্তি ছিলো, বুদ্ধি ছিলো। বললেন–

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো।'

উম্মে সোলাইম এবার আবু তালহাকে নাগালের ভিতরে পেয়ে বললেন–

'আবু তালহা! তোমার বিবেকে প্রশ্ন জাগে না– এমন নিষ্প্রাণ কাঠের টুকরোকে নিজের উপাস্য বানাতে? শোনো! তুমি ইসলাম কবুল করলেই বিবাহ হবে এবং মোহর ছাড়াই আমি বিবাহে রাজি। আবারো বলছি, তোমার ইসলাম গ্রহণই মোহর হিসাবে সাব্যস্ত হবে।'

আবু তালহা উম্মে সোলাইমের যুক্তিপূর্ণ কথায় লা-জওয়াব হয়ে বললেন–

'আমি একটু ভেবে দেখি।'

আবু তালহা এই বলে চলে গেলেন। কিন্তু একটু পরই ফিরে এসে বললেন–

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল।'

এ ঘোষণায় উম্মে সোলাইম ভীষণ খুশি হলেন। বললেন–

'আনাস!' আমাকে আবু তালহার সাথে বিবাহ করিয়ে দাও!'

এরপরে আবু তালহার সাথে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেলো। দু'জনেই খুশি। এ খুশি যতোটা না বিবাহ সম্পন্ন হওয়ায়, তারে চেয়ে বেশী ঈমান নসীব হওয়ায়। আবু তালহার ঈমানের বদৌলতে তাই নিজের অধিকার ছেড়ে দিলেন উম্মে সোলাইম। ইসলাম ঘোষিত ব্যক্তিস্বার্থকে ছেড়ে দিলেন দ্বীনী স্বার্থের সামনে।

বলো তো, উম্মে সোলাইমের মোহরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মোহর আর কী হতে পারে? হ্যাঁ, ইসলাম তাঁর মোহর! টাকা নয়, পয়সা নয়, সোনা নয়, দানাও

নয়– ইসলাম তাঁর মোহর! এমন সৌভাগ্য ক'জনের হয়?

শুধু ইসলামের জন্যে নিজের অধিকার কীভাবে ছেড়ে দিলেন তিনি? শুধু ইসলামের স্বার্থে তিনি নিজেকে মোহরহীন এক 'সত্তা' বধূতে নামিয়ে আনলেন! হে নারী! তোমার জন্যে আছে এখানে এবং সামনে অনেক শিক্ষা। নেবে কি তুমি শিক্ষা?

হ্যাঁ, উম্মে সোলাইম ছিলেন এমন এক মহিয়সী নারী, যাঁর একমাত্র ব্রত ছিলো ইসলাম ও ইসলামের নবীর খিদমত করা। ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধিকে তিনি মনে করতেন নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি। শোনো, তাঁর কুরবানী'র আরো কাহিনী–

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন আনসাররা আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে তাঁকে স্বাগত জানালো। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রা.-এর বাড়িতে অবতরণের পর দলে দলে সাহাবায়ে কেরাম তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে সমবেত হলেন। অন্য সবার মতো তিনিও তাঁর সাক্ষাত লাভের জন্যে লালায়িত হলেন। একদিন উম্মে সোলাইম সবার সঙ্গে বের হলেন নবীজীর সাথে সাক্ষাত করতে। তাঁর খিদমতে কিছু পেশ করতে। সে সুযোগ যখন এলো, তখন তিনি নিজের কলিজার টুকরো মানিককে ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না– তাঁর খিদমতে পেশ করার মতো। মানিক আর কেউ নন, ছেলে আনাস। তাকেই তিনি এগিয়ে দিলেন আল্লাহর নবীর দিকে আর বললেন–

'হে আল্লাহর রাসূল! আমার ছেলে আনাস এখন থেকে সব সময় আপনার খিদমতে থাকবে আপনার সেবা করার জন্যে।'

এরপর তিনি আর দাঁড়ালেন না, চলে গেলেন খুশিমনে গৃহে। ইতিহাস বলে; সেদিন থেকেই হযরত আনাস আল্লাহর নবীর কাছে থেকে গেলেন এবং তাঁর সকাল-সন্ধ্যার খাদেম হয়ে গেলেন।

ধন্য তুমি হে উম্মে সোলাইম!

'গতকাল' তুমি আবু তালহার ইসলাম গ্রহণকে প্রাধান্য দিয়ে নারীর বিশেষ অধিকার মোহরের দাবী ছেড়ে দিলে আর আজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভালোবাসায় ছেড়ে দিলে নিজের ছেলের অধিকার!'

উম্মে সোলাইমের সাথে কিছুক্ষণ।

উম্মে সোলাইমের ভিতর-বাহির ছিলো এক। লৌকিকতা তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি ছিলেন এক বিস্ময়- ঘরে এবং বাইরে। আল্লাহ্‌র ইবাদত আর স্বামীর খিদমত- এ দু-ই ছিলো তাঁর জীবনের সেরা ব্রত। অনেক মহিলা আল্লাহ্‌র ইবাদত করলেও স্বামীর খিদমত ও আনুগত্যকে এবং স্বামীর মন-তালাশকে দরকার মনে করে না, উম্মে সোলাইমের কাহিনী থেকে তারা নেবে কি কোনো শিক্ষা?

কিছুদিন পর আবু তালহার ঘরে তাঁর এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। সুন্দর চাঁদ-চাঁদ চেহারা। নাম রাখা হলো- আবু উমায়ের। আবু তালহা খুব ভালোবাসতেন তাকে। আল্লাহ্‌র নবীও ভালোবাসতেন তাকে। আল্লাহ্‌র নবী তার পাশ দিয়ে যেতেন আর দেখতেন সে ছোট্ট একটি পাখি নিয়ে খেলা করছে। পাখিটার নাম- নুগায়ের। পাখিটা একদিন মরে গেলো। নবীজী দেখলেন আবু উমায়ের মন খারাপ করে বসে আছে। তিনি তখন একটু মজা করে বললেন-

'আবু উমায়ের! কই গেলো তোমার নুগায়ের?!'

আবু উমায়ের হঠাৎ একদিন অসুস্থ হয়ে পড়লো। প্রিয় ছেলের অসুস্থতায় আবু তালহা ভীষণ ভেঙে পড়লেন। অসুস্থতা দিন দিন বাড়তে লাগলো। একদিন আবু তালহা একটা প্রয়োজনে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট গিয়েছিলেন। ফিরলেন বেশ দেরীতে। এর মধ্যেই ছেলের অসুস্থতা আরো বেড়ে গিয়ে সে মৃত্যুবরণ করলো। তখন সন্তানের পাশেই বসা ছিলেন উম্মে সোলাইম। আত্মীয়-স্বজনের ভিতরে শোকের ছায়া নেমে এলো। নেমে এলো অনেকের চোখে শোকাশ্রু। উম্মে সোলাইম সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন-

'সাবধান! তোমরা কেউ আবু তালহাকে মৃত্যু সংবাদ দিয়ো না, যা বলার আমি নিজেই বলবো।'

এরপর তিনি তাঁর ছেলেকে গৃহকোণে কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখে স্বামীর জন্যে খাবারের আয়োজন করলেন। আবু তালহা ফিরে এসে তাঁর কাছে জানতে চাইলেন-

'ও কেমন আছে?'

উম্মে সোলাইম বললেন–

'আগের চেয়ে ভালো।'

আবু তালহা তাকে দেখতে যেতে উদ্যত হতেই তিনি বাধা দিয়ে বললেন–

'এখন না! ও শান্ত, ওকে নাড়াবেন না।'

এরপর তিনি আবু তালহাকে রাতের খাবার পরিবেশন করলেন। স্বামী তৃপ্তিভরে খেলেন। তারপর তিনি স্বামীর জন্যে সাজগোজ করলেন। স্বামী আকৃষ্ট হয়ে স্ত্রী সহবাস করলেন।

উম্মে সোলাইম যখন দেখলেন যে, স্বামী তাঁর এখন তৃপ্ত ও সুখপুষ্ট– শারিরীকভাবে ও মানসিকভাবে, তখন তিনি বললেন–

'আবু তালহা! বলো তো, কোনো সম্প্রদায় যদি কোনো পরিবারকে কোনো জিনিস ধার দেয়, অতঃপর তারা যদি তাদের জিনিস ফেরত চায়, তাহলে সে পরিবারের কি উক্ত জিনিস ফেরত না দেয়ার অধিকার আছে?'

আবু তালহা জবাবে বললেন–

'না, ফেরত না দেয়ার কোনো অধিকার তাদের নেই।'

উম্মে সোলাইম এবার বললেন–

'আমাদের প্রতিবেশীদের ব্যাপারে তুমি কি আশ্চর্যবোধ করবে না?'

'কেনো? তাদের কী হয়েছে?'

'এক সম্প্রদায় তাদেরকে ধার দিয়েছিলো। সে ধারের জিনিস অনেক দিন পর্যন্ত তাদের কাছে থাকার কারণে তারা ধরেই নিয়েছিলো যে, তারাই মালিক হয়ে গেছে। এরপর যখন প্রকৃত মালিক ধারের জিনিস চাইতে এলো, তখন তারা তা ফেরত দিতে অপ্রস্তুত হলো।'

আবু তালহা বললেন–

'বড়ো খারাপ কাজ করেছে তারা!'

তখন উম্মে সোলাইম বললেন–

'এই যে তোমার ছেলে, ও ছিলো আল্লাহর দেয়া ধারের জিনিস! তিনি এখন তাকে নিজের কাছে তুলে নিয়ে গেছেন! তোমার ছেলের ব্যাপারে

ধৈর্য ধরো এবং আল্লাহর কাছে সওয়াবের আশা করো!'

এ পর্যন্ত শোনার পর আবু তালহা অস্থির হয়ে উঠলেন। পিতৃত্বের বেদনা-তন্ত্রীগুলো 'আহ!' করে উঠলো। তবু তিনি সবর করে বললেন–

'কসম আল্লাহর! এ রাত্রে তুমি আমাকে ধৈর্যে পরাস্ত করতে পারবে না!'

এরপর তিনি ছেলের কাফন-দাফন সম্পন্ন করলেন। সকালে উঠে ছুটে গেলেন দরবারে নববীতে। বললেন সব কথা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের (স্বামী-স্ত্রীর) জন্যে বরকতের দু'আ করে দিলেন।

হাদীস বর্ণনাকারী বলেন–

'এরপর আমি তাঁদের ঔরসে জন্ম লাভ করা সাত সাতটি সন্তানকে দেখেছি মসজিদে। সবাই কুরআনে কারীমের হাফেজ ছিলেন।'

কী দেখলে হে নারী? এতোক্ষণ উম্মে সোলাইমের সাথে থেকে কী পেলে? কী শিখলে? সকল প্রতিকূলতা ডিঙ্গিয়ে দ্বীনকে আকড়ে ধরে কোথায় গিয়ে উন্নীত হয়েছেন উম্মে সোলাইম! দেখেছো কি কখনো এমন স্ত্রী, যাঁর চোখের সামনে কলিজার টুকরো সন্তানের মৃত্যু হলো, তারপরও তিনি অবিচল থেকে, ধৈর্য ধরে কী চমৎকার করেই না স্বামীর খিদমতে আত্মনিয়োগ করলেন! শারীরিক এবং মানসিক খিদমত!! পাবে কি তুমি কোথাও এর কোনো নজীর? তুমি নিজেই হয়ে যেতে পারো না তার নজীর? নতুন উম্মে সোলাইম? পৃথিবীতে উম্মে সোলাইমদের ভীষণ প্রয়োজন! হতাশার কথা হলো, তাঁদের সংখ্যা বাড়ছে না। দিন দিন কমে যাচ্ছে! বড়োই হতাশার কথা!

কতো কোমল উম্মে সোলাইমের কোমলতা!

কতো কমনীয় উম্মে সোলাইমের কমনীয়তা!

পৃথিবীর কোন্ ইতিহাসের কোন্ নারীর কাছে খুঁজে পাবে তুমি এমন কোমল কমনীয় নারীর স্বামী-ভক্তি ও স্রষ্টা-ভক্তি?

উম্মে সুলাইমের সাথে আরো কিছুক্ষণ।

সুতরাং যে মহিলার ঈমান ও দ্বীন এবং সততা ও দৃঢ়তা হবে এমন, তাঁর বরকত ও কল্যাণময়তা পরিবারকে আলোকিত করবেই। সুকুমার হবেই তাঁর কারণে তাঁর ছেলেরা। সঠিক পথে চলবেই তাঁর কারণে তাঁর মেয়েরা। আর তাঁর সততার বরকতে তাঁর স্বামীও প্রভাবিত হবেনই। তাই উম্মে সোলাইমের সাথে বিবাহ হওয়ার পর আবু তালহার সম্মান ও মর্যাদা যদি বেড়ে যায়, তাহলে অবাক হওয়ার কিছুই নেই!

উম্মে সোলাইম স্বামীকে বরাবরই উদ্বুদ্ধ করতেন দাওয়াত ও জিহাদে। আল্লাহর ইবাদতে আরো বেশী নিবিড় হতে। স্ত্রীর এ উৎসাহদান বৃথা যায় নি। তিনি স্ত্রীর কথায় কী যেনো খুঁজে পেতেন। তাই ভীষণ প্রভাবিত হতেন।

নমুনা দেখো!

ওহুদ যুদ্ধ। তীরন্দাযদের ভুলের মাশুল গোনতে হচ্ছে। মুসলিম শিবিরে নেমে এসেছে চরম বিশৃঙ্খলা। মারাত্মক বিপর্যয়। সাহাবায়ে কেরাম দিশেহারা। কেউ কেউ লুটিয়ে পড়েছেন শাহাদতের লাল বিছানায়। কেউ কেউ দলবিচ্ছিন্ন হয়ে ছুটোছুটি করছেন এখানে-ওখানে। মুশরিকরা সুযোগ পেয়ে চলে এসেছে একদম আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাছে। তাঁকে 'কতল' করতে। বিশিষ্ট সাহাবীগণ তখন তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালেন। নিজেরাও তাঁরা ভীষণ রণক্লান্ত। আহত। রক্ত ঝরছিলো তাঁদের ক্ষতস্থান থেকে। খসে খসে পড়ছিলো তাঁদের দেহের গোশতও। এ অবস্থায়ও নিজেদের কথা ভুলে গেলেন। ঢাল হয়ে ঘিরে রাখলেন তাঁরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। ধেয়ে আসছে বর্শার আঘাত, কিন্তু তা লাগছে তাঁদের দেহে। আসছে তলোয়ারের আঘাত, আর ঠেকাচ্ছেন তাঁরা পাল্টা আঘাতে, প্রয়োজনে বুক পেতে। এঁদের মাঝে ছিলেন আবু তালহাও। তিনি উচ্চ কণ্ঠে বলছিলেন–

'يا رسول الله لا يصيبك سهم .. نحري دون نحر'

'হে আল্লাহর রাসূল! একটি তীরও আপনার গায়ে এসে লাগবে না। আমার গলা আপনার গলার বরাবর (করে আমি লড়াই করে যাবো)!'

কাফেররা চারপাশ থেকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে আক্রমণ করে যাচ্ছিলো। কারো হাতে তীর-ধনুক। কারো হাতে তলোয়ার। কারো হাতে খঞ্জর। আবু তালহা আঘাতে আঘাতে কাবু হয়ে গেলেন। মন তাঁর দুর্বল না হলেও অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তিনি দুর্বল হয়ে গেলেন। তিনি জমিনে পড়ে গেলেন। তখন আবু উবায়দাহ দ্রুতবেগে তাঁর কাছে ছুটে এলেন। দেখলেন আবু তালহা ধরাশায়ী। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

'دونكم أخاكم فقد أوجب'

> 'এই যে তোমাদের কাছে তোমাদের ভাই। তার সহযোগিতা তোমাদের উপর জরুরী।'

তখন কয়েকজন সাহাবী তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে গেলেন। দেখা গেলো তাঁর দেহে ষোল সতেরটি আঘাত।

হ্যাঁ, উম্মে সোলাইমের সাথে বিবাহের পর আবু তালহার একমাত্র ব্রত ছিলো দ্বীনের পতাকা বুলন্দ করা। আল্লাহর রাসূল তাঁর শানে বলেছেন—

'لصوت أبي طلحة في الجيش أشد على المشركين من فئة'[1]

> 'যুদ্ধক্ষেত্রে মুশরিকদের কাছে আবু তালহার একার কণ্ঠ একদল মানুষের কণ্ঠের চেয়েও অধিক শক্তিশালী ও কঠোর।'

এই যদি হয় শুধু তাঁর কণ্ঠের অবস্থা, তাহলে বলো না— কী হবে তাঁর যুদ্ধকালীন তাঁর বীরত্বের অবস্থা?

ইতিহাস আমাদেরকে জানিয়েছে— তিনি ছিলেন আরবের এক শ্রেষ্ঠ তীরন্দায।

তুমিও হও না তাঁর মতো!!

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু পুরুষদেরকেই

---

(1) المسند والفتح الرباني (٥٨٩/٢٢) بإسناده رجاله ثقات.

দাওয়াত দেন নি, নারীদেরকেও দিয়েছেন। শুধু পুরুষদেরকেই বাইয়াত করেন নি, মহিলাদেরকেও করেছেন। কথাও বলেছেন পুরুষের পাশাপাশি মহিলাদের সাথে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ সবাই সমান- শাস্তি ও পুরস্কারে। আল্লাহ বলেন-

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

'মু'মিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে, তাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দময় জীবন দান করবো এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করবো।'

মানবাধিকারেও তারা উভয়ে সমান। স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই একে অন্যের প্রতি কিছু দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

ألا إن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاً

'মনে রাখবে, তোমাদের স্ত্রীদের উপর রয়েছে তোমাদের হক ও অধিকার এবং তোমাদের উপরও রয়েছে তোমাদের স্ত্রীদের হক ও অধিকার।'

নারী-পুষের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড কী? আল্লাহ বলছেন-

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ

'তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচে' বেশী সম্মানিত সে-ই, যে তোমাদের মধ্যে সবচে' বেশী মুত্তাকী।'

নারী যখন নিজের সম্মান নিজে বজায় রাখবে সবাই তাকে সম্মান করবে। ততোক্ষণ পর্যন্ত নারী সম্মানিত ও মূল্যবান, যতোক্ষণ পর্যন্ত সে বিশ্বস্ত ও আমানতদার। যখনই সে বিশ্বাস নষ্ট করবে তখনই সে তুচ্ছ ও মূল্যহীন হয়ে যাবে।

একটু লক্ষ্য করো আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিকে। মক্কা বিজয়ের সময় কাফেররা দিশেহারা হয়ে পড়লো। কেউ আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে তলোয়ার বের করলো, কেউ ইসলাম কবুল করলো আর কেউ আত্মগোপনে চলে গেলো। যারা তরবারী ধারণ করেছিলো তাদের মধ্যে দু'জনের লড়াই হয়েছে হযরত আলী রা.-এর সাথে। পরে তারা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যায়। এবং আশ্রয় নেয় আলীভগ্নী উম্মে হানির গৃহে। হযরত উম্মে হানি তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করেন। একটু পরই হযরত আলী রা. সেখানে তলোয়ার নিয়ে পৌঁছে যান। এসেই বলেন–

'আমি লোক দু'টিকে মেরে ফেলবো!'

উম্মে হানি কিন্তু তা হতে দিলেন না। বরং তারা যে কামরায় ছিলো তার দরোজাটা শক্ত করে লাগিয়ে দিলেন। তারপর দ্রুত ছুটে গেলেন আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকটে। নবীজী তাঁকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসতে দেখে বললেন–

'উম্মে হানি! তোমাকে স্বাগত জানাই! কী মনে করে এলে?'

উম্মে হানি বললেন–

'আলী এমন দু'জন লোককে হত্যা করতে চায়, যাদেরকে আমি নিরাপত্তা-আশ্রয় দিয়েছি!'

আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–

'তুমি যাদের মুক্তি দিয়েছো আমিও তাদের মুক্তি দিলাম। তুমি যাদের নিরাপত্তা-আশ্রয় দিয়েছো আমিও তাদের নিরাপত্তা-আশ্রয় দিলাম! সুতরাং সে যেনো তাদেরকে হত্যা না করে!'

আল্লাহ নারীদেরকে অধিকার ও সম্মান দিয়েছেন তাদের স্থির প্রশান্ত জীবনের স্বার্থে। যেমন নারীর অনুমতি ব্যতিত তাকে বিবাহ দেয়া যাবে না। তার অনুমোদন ছাড়া তার মালে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। যদি কোনো দুষ্ট লোক তার চরিত্রে কালিমা লেপন করে ও অপবাদ দেয়, তাহলে ঐ কালিমা লেপনকারী ও অপবাদদানকারীর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। তার পিতাকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে তার সাথে ভালো আচরণ করতে। তার সন্তানকে আদেশ করা হয়েছে তাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান

করতে, তার প্রতি সদা বাধ্য ও অনুগত থাকতে। তার ভাইকে বলে দেয়া হয়েছে– সাবধান! বোনের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করবে না!

বরং অনেক ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে পুরুষেরও উপর। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ
وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ.

- 'আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। মা সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দু' বছরে। সুতরাং আমার প্রতি এবং তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।'

বোখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনা–

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো–

'হে আল্লাহ্র রাসূল! মানুষের ভিতরে আমার সদ্ব্যবহারের অধিক হকদার কে?' তখন তিনি বললেন– 'তোমার মা, অতঃপর তোমার মা, অতঃপর তোমার মা তারপর তোমার বাবা।'

আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর দেখলেন, এক লোক কা'বা তাওয়াফ করছে। তখন তার পিঠে ছিলো এক বৃদ্ধা। তিনি লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন–

'এ কে?'

লোকটি বললো–

'আমার মা! বিশ বছর ধরে আমি তাঁকে পিঠে বহন করে চলেছি। ইবনে উমর! আপনার কি মনে হয়, আমি আমার মা'র হক আদায় করতে পেরেছি?'

তখন হযরত ইবনে উমর বললেন–

'না, না, তুমি তাঁর একটি দীর্ঘশ্বাসেরও হক আদায় করতে পারো নি!'

নরওয়ে থেকে আফ্রিকা

মুসলিম উম্মাহর দুর্ভাগ্য; তাদের মেয়েরা দ্বীনের সহযোগিতা করছে না। বরং দ্বীন থেকে দিনে দিনে তারা দূরে সরে যাচ্ছে। ফলে অন্যায়-অনাচার প্রকাশ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। অপরাধের বিভিন্ন ভয়াবহ চিত্র সমাজ জীবনে অন্ধকার ঢেলে দিচ্ছে। ইসলামী আইন লঙ্ঘনের যেনো মহড়া চলছে। নারীর জন্যে ইসলাম পর্দার যে বিধান দিয়েছে, তা নারীরাই লঙ্ঘন করছে। অবহেলায়। অবলীলায়। বরং তাচ্ছিল্যভরে। নারীরা হারিয়ে যাচ্ছে প্রণয় ও ভালোবাসার নামে– অবৈধ সম্পর্কের তিমির আঁধারে।

মাঝে-মধ্যে আমার মনে হয়– আল্লাহ্‌র আযাব বুঝি আমাদেরকে সহসাই গ্রাস করে নেবে। সবচে' বেদনাদায়ক হলো, অন্যায়-অনাচার ও সীমালঙ্ঘনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত যারা, তারা আমাদেরই আত্মীয়, বোন ও সহপাঠিনী। এ-সব কিছুর পরও তাদেরকে হাত ধরে আমরা ফিরিয়ে আনছি না। আমরা প্রতিবাদমুখর হচ্ছি না। অথচ আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ঘোষণা হলো–

'তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অন্যায় কাজ দেখে, সে যেনো তার প্রতিবাদ করে ..।'

বলো তো, তুমি কি তোমার সাধ্য অনুযায়ী অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করেছো? হায়! যদি না করে থাকো তাহলে কী অবস্থা হবে তোমার কেয়ামতের দিন? যদি তোমার বান্ধবী কিংবা সহপাঠিনী বা সখী তোমার বিরুদ্ধে চীৎকার করে করে এই নালিশ করে– 'কেনো তুমি আমাদেরকে অন্যায় কাজ করতে দেখেও বাধা দাও নি? কেনো আমাদেরকে উপদেশ দাও নি? কেনো বোঝাও নি?' তাহলে কী জবাব দেবে তুমি?

অথচ অপরদিকে বিধর্মীরা তাদের বাতিল ধর্মের জন্যে কী ত্যাগ ও কুরবানীই না পেশ করে থাকে। নমুনা দেখবে?

শেষ নেই। যেতে যেতে চোখে পড়ছিলো শুধু বালিয়াড়ি আর বালিয়াড়ি। যে গ্রামেই গিয়ে পৌঁছতাম, গ্রামবাসী চোখ উল্টে আমাদেরকে সতর্ক করে দিতো– ডাকাত ও দুস্যদের ব্যাপারে।

এক সময় আমরা নিরাপদেই আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে যাই। সময়টা ছিলো রাতের বেলা। আমার আগমনে ওরা খুব খুশি হলো এবং আমার জন্যে আলাদা তাঁবু খাটালো। দূর-সফরের ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসছিলো। তাই দেরী না করে তাঁবুর জীর্ণ বিছানাতেই গা এলিয়ে দিলাম। তখন মনে এলো এলোমেলো কতো চিন্তা। বলতে পারো আমি তখন কী নিয়ে ভাবছিলাম?

আমি কিছুটা গর্ব অনুভব করছিলাম। যা কিছুটা অহঙ্কারের পর্যায়ে চলে যাচ্ছিলো। ভাবছিলাম– কোন্ সে টানে আমি এ দুর্গম পথের সফরে সাহস করলাম? আমি ছাড়া অন্য কেউ সম্ভবত এমন সফরে সাহস করতো না। কে বরদাশত করবে এতো কষ্ট, এতো যাতনা? আমি ছাড়া? অর্থাৎ আমি শুধু আমাকেই দেখতে পাচ্ছিলাম। কেবল 'আমি আমি' করছিলাম। মনে হলো, শয়তান আমার ভিতরে কাজ শুরু করে দিয়েছে। আমি বিভ্রান্ত হয়েই পড়ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইস্তিগফার পড়তে পড়তে শুয়ে পড়লাম।

সকালে আমি বেরিয়ে পড়লাম আশ-পাশের ঘর-বাড়ি দেখার জন্যে। ঘুরতে ঘুরতে শরণার্থী শিবির থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা কূপের কাছে চলে এলাম। দেখলাম একদল নারী মাথায় করে পানির ডেক নিয়ে বাড়ি ফিরছে। এদের মাঝে এক মহিলার গায়ের রঙ সাদা। আফ্রিকান কালো মহিলাদের মাঝে এমন সাদা রঙের মহিলা দেখে আমি ভেবেছিলাম– শরণার্থী শিবিরের কোনো মহিলাই হবে এ। হয়তো শ্বেত রোগের কারণে ওকে এমন সাদা দেখাচ্ছে। কিন্তু আমার সঙ্গিটিকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি জানালেন যে, এ মহিলা নরওয়ের অধিবাসিনী। বয়স ত্রিশ। খৃষ্টান। ছয় মাস ধরে এখানে আছে। আফ্রিকান সম্প্রদায়ের সাথে ও একেবারে মিশে গেছে। এখন পরেও ও এ-দেশের পোষাক। খায়ও এ-দেশের খাবার। আমাদের কাজেও ও সহযোগিতা করে। রাতের বেলা সব মহিলাদেরকে জড়ো করে তাদের সাথে ও বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে

আলোচনা করে। তাদেরকে লেখাপড়া শেখায়। মাঝে-মধ্যে নাচও শেখায়। কতো এতিমের মাথায় ও হাত বুলিয়ে দিয়েছে এবং কতো বেদনা-পীড়িত মানুষের বেদনা লাঘব করে দিয়েছে।'

নরওয়ের তরুণীটির কথা একটু ভাবো তো! কিসের টানে ছুটে এলো ও- এই দূর মরুদেশে? অথচ দ্বীন ও আকিদায় ও ভ্রান্ত? কেনো ও ছেড়ে এলো ইউরোপের সভ্যতা এবং সেখানকার সবুজ-শ্যামল বাগ-বাগিচা? কোন্ সে পরশে ও ছয় মাস ধরে পড়ে আছে এই অক্ষম-অসহায় লোকজনের সাথে, অথচ যৌবন-বসন্তের একেবারে শীর্ষে ও অবস্থান করছে? এ বয়সে যৌবনের স্বাদ-রস-গন্ধ- কাকে না হাতছানি দেয়?

বলো তো, ওর কথা ভাবতে ভাবতে তোমার কাছে কি নিজেকে ভারী ছোট মনে হচ্ছে না? বোঝো না! ও খৃষ্টান ধর্মের এক ভ্রষ্টা নারী হয়েও আফ্রিকার প্রতিকূলতাকে কষ্টে-সৃষ্টে জয় করে ওখানে কেনো পড়ে আছে? শুধু কি প্রতিকূলতা? মহা প্রতিকূলতা! আফ্রিকার ঝোপ-জঙ্গল-এর সাথে সখ্যতা গড়ে বসবাস করাটা ক'জনের পক্ষে সম্ভব? তারপরও বৃটেন-আমেরিকা-ফ্রান্স থেকে কেনো ছুটে আসছে এই আফ্রিকায়- তরুণীরা যুবতীরা? কেনো ওরা প্রাসাদের বিলাসবহুল জীবন ছেড়ে এখানে এসে আশ্রয় নিচ্ছে ছোট্ট ছোট্ট কুঁড়েঘরে বা মাটির ঘরে? আর খাচ্ছে প্রায় অখাদ্য? পান করছে নদী-নালার অশুদ্ধ পানি? কেনো? কেনো? ... শিশুদেরকে লালন-প্রতিপালন করার জন্যে! অবলা নারীদেরকে চিকিৎসা দেওয়ার জন্যে! অন্য কথায়- দ্বীনি ব্রত পালনের জন্যে! যে দ্বীন বিকৃত! যে দ্বীন মনগড়া বর্ণনায় জর্জরিত! এমন দ্বীনের খিদমতের জন্যেই ওরা বেছে নেয় প্রাসাদী জীবনের বদলে দূর মরু-আফ্রিকার কষ্ট-যাতনাঘেরা ফকিরী জীবন! ওরা যখন ওদের এ 'ধর্মীয় ব্রত' পালন শেষে স্বদেশে ফিরে যায়, তখন দেখলে চেনাই যায় না! কী ছিলো আর কী হয়ে ফিরেছে! বদন-দীপ্তি নিষ্প্রভ! ত্বকের মসৃণতা উধাও!

বলবে কি হে আমার মুসলিম বোন! তাদের তুলনায় কী তোমার দান-অবদান- তোমার সত্য ধর্ম ইসলামের জন্যে?

إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ

مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ

'যদি তোমরা কষ্ট পাও তবে তারাও তো কষ্ট পায় অথচ আল্লাহুর নিকট তোমরা যা আশা করো তারা তা আশা করে না।'

আরেক জন দাঈ'র বক্তব্য লক্ষ্য করো–

'আমি তখন জার্মানীতে। কে যেনো দরোজায় নক করলো। কাছে এসে দেখলাম– এক তরুণী দরোজায় দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞাসা করলাম–

'কী চাও?'

'দরোজা খুলুন।'

'না, দরোজা খোলা যাবে না। আমি মুসলমান। আমার স্ত্রী ঘরে নেই। এই অবস্থায় প্রবেশ করা তোমার জন্যে জায়েয নেই।'

কিন্তু তরুণীটি এতেও ক্ষান্ত হলো না। চলেও গেলো না। আমি দরোজা খুলতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছিলাম। এক পর্যায়ে সে বললো–

'আমি একটা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে এসেছি। আপনাকে কিছু বই-পুস্তক ও আমাদের পরিচিতিমূলক কিছু কাগজপত্র দিয়েই চলে যাবো। দয়া করে দরোজাটা একটু খুলুন।'

আমি বললাম–

'না, আমার এ সবের প্রয়োজন নেই।' এই বলে আমি সেখান থেকে আমার কামরায় চলে গেলাম। তখন সে দরোজার ফাঁক দিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে তার দ্বীন সম্পর্কে দশ মিনিটের মতো সময় ধরে ব্যাখ্যা দিয়ে গেলো। ওর বক্তব্য শেষ হলে আমি দরোজার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলাম–

'কেনো এ পণ্ডশ্রম? নিজেকে এভাবে কেনো কষ্ট দিচ্ছো? আমি তোমার কথা শুনতে চাই না, তবু কেনো শোনাচ্ছো?

ও বললো–

'আপনি শুনুন আর না-ই শুনুন। আমি বলতে তো পেরেছি! আমি এখন স্বস্তি অনুভব করছি। কেননা, আমি যদ্দুর সম্ভব আমার দ্বীনের হক আদায় করতে পেরেছি।'

إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ

'যদি তোমরা কষ্ট পাও তবে তারাও তো কষ্ট পায় অথচ আল্লাহ্‌র নিকট তোমরা যা আশা করো তারা তা আশা করে না।'

জিজ্ঞাসা করো নিজের কাছে!

বলো তো, ইসলামের জন্যে তুমি কী করেছো, কী সয়েছো? ক'জন নারী তোমার হাতে তাওবা করেছে? দিশেহারা তরুণীদের হেদায়াতের জন্যে তোমার কতোটুকু শ্রম ও সম্পদ ব্যয় হয়েছে?

অনেক 'পুণ্যবতী' নারীদেরকেই বলতে শুনেছি–

'দাওয়াত দেয়ার দুঃসাহস করতে পারবো না আমি। অন্যায় কাজের বিরোধিতায় নামাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

আশ্চর্য!! তাহলে এক পাপাচারিণী কণ্ঠশিল্পী হওয়ার দুঃসাহস কেমনে হয় তোমার? এই যে হাজার হাজার মানুষের সামনে গলা ছেড়ে আর রূপ 'খুলে' গাও এবং নাচো, তখন তোমার লজ্জা-সংকোচ কোথায় যায়? জানো না, তারা তোমার গান 'খাওয়ার' আগে গিলে গিলে তোমার রূপ খায়? গান গাইতে গিয়ে কেনো বলো না– আমার লজ্জা হয়, আমার ভয় হয়?

নির্লজ্জ নৃত্যশিল্পী হতে লজ্জা হয় না, হাজার হাজার মানুষের সামনে 'শরীর প্রদর্শনী'তেও অরুচি ও অস্বস্তি হয় না, তা যতো অরুচি আর অস্বস্তি আল্লাহ্‌র পথে মানুষকে ডাকতে ও আনতে!

শোনো মেয়ে!

আমরা তোমার শত্রু নই, চির কল্যাণকামী। তাহলে তুমি কেনো তোমার বোনের কল্যাণ কামনা করবে না? কেনো তাকে আল্লাহ্‌র পথে ডাকবে না? শয়তানের দলের সাথে তোমার বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যাবে বলে?!

আরো অবাক-করা বিষয় হলো– কোনো কোনো তরুণী অশ্লীলতা বিনিময় করে! একে অপরকে অশ্লীল পত্রিকা দেয়!। অশ্লীল গানের ক্যাসেট ও সিডি দেয়। একে অপরকে ডেকে নিয়ে যায়– খারাপ ও বিপজ্জনক আসরে।

এ নয় কি অন্যায় ও অশ্লীল কাজে সহযোগিতা?! শয়তানের দলভুক্ত হওয়ার জন্যে প্রতিযোগিতা?! অন্যায় কাজে একে অপরকে টানার ও সহযোগিতা করার এই যে ভালোবাসা, তা একদিন রূপান্তরিত হবে শত্রুতা ও ঘৃণায়। আল্লাহ বলেন–

الأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ

'বন্ধুরা সেদিন একে অপরের শত্রু হয়ে পড়বে, তবে মুত্তাকিরা ব্যতিত।'

এ হলো হাশরের ময়দানে তাদের অবস্থা। অপমান ও অনুশোচনার পোষাক পরানো হবে তাদেরকে। আর জাহান্নামে! এ নাফরমানদের একটি দল সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে বলেছেন–

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ

'তারপর কেয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে। এবং পরস্পরকে অভিসম্পাত দেবে। তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম। এবং তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।'

হ্যাঁ, তারা একে অপরকে অভিসম্পাত দেবে! অথচ দুনিয়াতে একজন আরেকজনের সাথে গভীরভাবে মিশেছে। গল্পে গল্পে রাত কাটিয়ে দিয়েছে। হাস্যরসে শত শত মাতাল সন্ধ্যা পার করে দিয়েছে। হয়েছে ভালোবাসার উষ্ণ বিনিময়। কিন্তু ভুল, সবই ছিলো ভুল! ক্ষণিকের মরীচিকাময় স্বপ্ন, চিরকালের লাঠিপেটা দুঃস্বপ্ন! সেদিন বলবে একজন আরেকজনকে–

'তুমিই তো আমাকে অবৈধ প্রেমালাপ আর অশ্লীলতার দিকে ডেকে এনেছিলে! তোমার উপর আল্লাহর লা'নত!'

অপরজন তার উত্তরে বলবে–

'বরং তোমার উপর আল্লাহর লা'নত। তুমিই না আমাকে দিয়েছিলে গানের ক্যাসেট!'

উত্তরে বলা হবে–

'আমার উপর নয়– তোমার উপরই আল্লাহর লা'নত! তুমিই আমার সামনে গোনাহ ও পাপাচারের 'রঙিন' জগৎ খুলে দিয়েছিলে!'

অপরজন নীরব থাকবে না। বলবে–

'না! না! তোমার উপরই লা'নত! গোনাহর পথ তুমিই আমাকে দেখিয়েছো!'

আশ্চর্য! কোথায় হারিয়ে গেলো দুনিয়ার রঙ-তামাসা ও হাসি-আনন্দের সেই দিনগুলো? কোথায় তলিয়ে গেলো ফিসফিসানি আর কানাকানির পরশ-ভোলানো সূর্যটা? 'মার্কেটে' ঘুরতে এসে সেই যে কলকলিয়ে হাসতে হাসতে একে অপরের উপর লুটিয়ে পড়তে, আজ তা কোথায়? কেনো আজ তোমরা একে অপরকে গালমন্দ করছো, অভিসম্পাত দিচ্ছো?

কারণ একটাই। আর তা হলো তোমরা কখনো একে অপরের কল্যাণ কামনায় এবং ভালো চাওয়ায় এক হতে পারো নি! এক হয়েছো তখন সূর্য ডুবেছে যখন! জাহান্নামের আগুন এখন সামনে। এ আগুন কি নিভার আগুন? তার লাভাস্রোত কখনো স্তিমিত হবে না! কখনোই না!

কোথায় তবে মাতৃজাতি?

আমাদের বর্তমান নারী জাতির অবস্থা কী? পূর্ববর্তী মহিয়সীগণের তুলনায় তারা কি অনেক অনেক গুণ পিছিয়ে নয়? তারা শরীতের বিরোধিতা করে যাচ্ছে পোষাকে-কথায়-দৃষ্টিতে। তাদেরকে উপদেশ দান করলে বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলে–

'সব মহিলাই তো এমন করছে! আমি স্রোতের উল্টো চলতে পারবো না!'

কী লজ্জার কথা!

কোথায় তোমার ঈমানী 'গায়রত'?

কোথায় তোমার দ্বীন পালনে দৃঢ়তা?

অন্যায়ের কাছে এতো সহজে আত্মসমর্পণ করতে তোমার লজ্জাবোধ হয় না? বিবেকের মাথা খেয়ে বসেছো নাকি?

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

'আল্লাহ এবং রাসূল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।'

আল্লাহ অভিসম্পাত দেয় যে সব নারীকে, বড়ো দুঃখ হয় তাদের জন্যে। এরা দ্বীন নিয়ে তামাশা করে। পুরুষের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাপড় পরে। কাঁধ খোলা রাখে। নারীত্বের মহিমা ও গোপন সৌন্দর্য প্রদর্শন করে। এদের উপর তো আল্লাহ্‌র লা'নত পড়বেই!

কোথায় সেই নির্লজ্জ নারী, যে উল্কি-চিহ্ন এঁকে দেয় নিজের কপালে-চেহারায়-অঙ্গে? এ-সব তো করে বেড়ায় বেশ্যারা? ভাসমান পতিতারা? আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

'উল্কি-চিহ্ন যে নিজে আঁকে এবং আরেকজনকে এঁকে দিতে বলে– উভয়ের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত।'

আর যারা নকল চুল ব্যবহার করে, তারাও বাঁচবে না– আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত থেকে।

হে অভিসম্পাতে অভিসম্পাতে জর্জরিত নারী!

জানো কি– আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত কী?

আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত হলো–

তাঁর রহমত থেকে বিতাড়িত হওয়া!

জান্নাতের পথ থেকে দূরে চলে যাওয়া!!

বলো না! তুমি কি চাইবে–

জান্নাতের পথ থেকে বিতাড়িত হতে?

দূরে সরে পড়তে? শুধুমাত্র এই-উল্কি-চিহ্নের কারণে কিংবা নকল চুল

হে বঞ্চিত নারী!

প্রবৃত্তি ও শয়তানের ডাকে যখন নারী সাড়া দেয়, তখই তার ইচ্ছে করে নিজেকে সুসজ্জিত করে পর পুরুষের সামনে পেশ করতে। প্রকাশ-ব্যাকুল হতে। তখন সে ভুলে যায়– আল্লাহ্‌র অভিসম্পাতের কথা। তার ভয়াবহ পরিণতির কথা।

যেভাবে এবং যা করে নারী নিজেকে সাজায়, তা যেমন অরুচিকর, তেমনি শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ। এর মধ্যে একটি হলো– ভ্রূকে সরু করা– উপড়ে ফেলে অথবা মুণ্ডিয়ে। যে নারী এমন কাজ করলো, সে শয়তানের নির্দেশই পালন করলো। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

> وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا.
>
> 'আমি তাদেরকে অবশ্যই নির্দেশ দেবো এবং তারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বিকৃত করবেই। আল্লাহ্‌র পরিবর্তে কেউ শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করলে সে স্পষ্টই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

সুতরাং ভ্রূ সরু করা– আল্লাহ্‌র লা'নত-এর শিকার হওয়ার কারণ। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর সূত্রে আবু দাউদ শরীফে বলা হয়েছে–

'উল্কি-চিহ্ন যারা নিজে আঁকে এবং আরেকজনকে এঁকে দিতে বলে, যারা ভ্রূ সরু করে এবং কপালের চুল উপড়ে ফেলে তারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির পরিবর্তনকারী। তাদের উপর আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিসম্পাত দিয়েছেন।'

এমন কাজ কেমন করে তুমি করতে পারো– যার পরিণতি আল্লাহর অভিসম্পাত? অথচ অপরদিকে তুমি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা ও রহমতও চাচ্ছো নামাজের ভিতরে এবং বাইরে! এ কী কথায়-কাজে অমিল-আচরণ নয়? একদিকে কামনা করছো আল্লাহ্‌র রহমত, অপরদিকে করছো এমন কাজ যা তোমাকে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। অদ্ভুত, বড়ো অদ্ভুত!!

হাক্কানী উলামায়ে কেরাম ভ্রূ সরু করা বা মুণ্ডানোকে হারাম বলেছেন। আমার সামনে এখন তা হারাম হওয়ার বিশটি ফতোয়া রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের দাবি হলো, তিনি যা করতে বলেছেন তা করা আর যা নিষেধ করেছেন তা না করা। উল্কি-চিহ্ন সে তো বিধর্মীদের সাথে মিশে যাওয়া। কেউ যদি কোনো সম্প্রদায়ের সাথে মিশে যায়, তাহলে সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে।

বোঝা গেলো, যে ভালোবাসবে যাকে তার হাশর হবে তারই সাথে। সুতরাং তুমি বলো না, 'অনেকেই তো তা করছে!' তাহলে আমি বলবো, অনেকেই তো মূর্তিপূজা করছে, তাই বলে তুমিও কি তাদের মতো মূর্তিপূজা করবে? অনেকেই ক্রুশ-চিহ্ন ঝুলিয়ে রাখে। তুমিও কি এ ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করবে? অপরাধিনীর সংখ্যাবৃদ্ধি পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার বৈধতা দেয় কি? তোমার আমল সম্পর্কে তোমাকেই জিজ্ঞাসা করা হবে। পৃথিবীতে তোমার জন্মের ধাপ লক্ষ্য করো।

প্রথমে তুমি ছিলে তোমার পিতার 'পৃষ্ঠদেশে'– একা।

তারপর এসেছো মায়ের গর্ভে– একা।

তারপর এসেছো পৃথিবীতে– একা।

মরবেও তুমি– একা।

পুনরুত্থিতও হবে– একা।

পুলসিরাত তোমাকে পার হতে হবে– একা।

আমলনামা পেশ করা হবে তোমাকে– একা।

আল্লাহ্‌র সামনে তুমি জিজ্ঞাসিতও হবে– একা।

আল্লাহ বলেছেন–

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمٰنِ عَبْداً. لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً.

'আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবে না– বান্দারূপে। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে গণনা করেছেন। এবং কেয়ামতের দিবসে তাদের সকলকেই তাঁর নিকট আসতে হবে একা একা।'

সমুদ্র তরঙ্গে

কতো মুসলিম যুবতী নারী ভেসে যাচ্ছে স্রোতের সাথে, ঢেউয়ের সাথে। গড্ডালিকা প্রবাহে। পর্দার ব্যাপারে উদাসীনতা হয়ে গেছে তার মজ্জাগত। ফাসাদ সৃষ্টিকারীরা বরং নীলনক্সা বাস্তবায়নকারী পাপাচারী কাফের-মুশরিকরা যে সব পোষাক বাজারে ছাড়ছে, তার উপর তারা হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। যা নারীকে না- ঢেকে বরং প্রবৃত্তি-তিয়াসী মানুষের চোখের সামনে আরো খুলে দেয়।

আশ্চর্য! কী করে তুমি ওদের খেলার পুতুল হতে পারলে? যা ইচ্ছে তা-ই তারা তোমাকে পরিয়ে যাচ্ছে? কখনো তোমার পরনে দেখা যাচ্ছে নক্সাকরা বুটিদার জামা। কখনো পরছো তুমি কোমর পর্যন্ত 'শর্ট' জামা। কখনো তোমার দু'কাঁধ থাকছে অনাবৃত। কখনো দেখা যায় বিশাল ঢিলা আস্তিন। এ সব বৈচিত্রে কী প্রাধান্য পাচ্ছে? কী প্রতিফলিত হচ্ছে? প্রাধান্য পাচ্ছে– নারীকে আরো বেশী আবেদনময়ী করে মানুষের চোখের সামনে পেশ করা এবং নারীর সত্যিকারের রক্ষাকবচ ও ভূষণ– পর্দাকে নির্বাসনে পাঠানো।

এভাবেই তোমার অজান্তে প্রতিফলিত হচ্ছে দুশমনের ইচ্ছা। নীলনক্সা। তুমি হচ্ছো ওদের খেলার পুতুল।

যে পোষাকে তোমার পর্দা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তা কেনো তুমি পারবে? আজকাল আরো লক্ষ্য করা যায়– মেয়েদের জামা এতো পাতলা কাপড়ে তৈরী হচ্ছে যে, শরীরের স্পর্শকাতর জায়গাগুলো সহজেই চোখে পড়ে। ভিতরে

শেমিজ জাতীয় কিছু পরলে তবে রক্ষে। নইলে পাতলা কাপড়ে প্রদর্শিত নারী-সৌন্দর্য কেবল কাতরতা ও লুলোপতা বাড়ায় 'অসুস্থদের' চোখে।

হিজাব ছেড়ে কেনো দুশমনের চাপিয়ে দেয়া এ 'ফ্যাশন'-এর পেছনে ছুটছো তুমি হে নারী? জানো না- হিজাব কী? বোঝো না হিজাবের মাহাত্ম্য? হিজাব হলো পুরুষের দৃষ্টি থেকে নারী-সৌন্দর্য ঢেকে রাখার একটি শরয়ী বিধান। পর্দা নিজেই সৌন্দর্যের প্রতীক। একে সুন্দর করার জন্যে আলাদা নক্সা বা অন্য কিছু করার প্রয়োজন নেই। মুসলিম শরীফের হাদীসে আল্লাহর রাসূল বলেছেন-

> صنفان من أهل النار لم أرهما .. رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس .. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا.
>
> 'দুই প্রকার জাহান্নামীকে আমি দেখি নি। এদের একটি প্রকার হলো একদল পুরুষ, যাদের সঙ্গে রয়েছে গরুর লেজের মতো চাবুক, যা দ্বারা তারা মানুষকে চাবকাচ্ছে। আর আরেকটি প্রকার হলো মহিলাদের একটি দল, যারা বাহ্যত পোষাক পরিহিত হলেও বস্তুত তারা প্রায় নগ্ন। যারা আকৃষ্ট হবে পুরুষের প্রতি এবং পুরুষদেরকেও আকৃষ্ট করবে নিজেদের প্রতি। তাদের মাথা হলো বখতি উটের কুঁজের মতো। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তার ঘ্রাণও পাবে না। যদিও তার ঘ্রাণ পাওয়া যাবে অনেক অনেক দূর থেকে।'

বলো তো, কে হতে চায় সেই নারী, যে পেতে চায় না জান্নাত কিংবা জান্নাতের সুগন্ধি?!

কেনো বোঝো না, এই যে পর্দাহীনতা ও উলঙ্গপনা- এ একটি মাধ্যম, শয়তানের মাধ্যম। এ মাধ্যম তোমাকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে- জানো? একজন পুরুষকে উত্তেজিত করে হারামে বা ব্যভিচারে লিপ্ত করা

পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। তুমি কি চাইবে– একজন পুরুষ শুধু তোমার বেপর্দার কারণে, রূপ প্রদর্শনের কারণে হারাম কাজে লিপ্ত হোক? মনে রাখবে, তুমি যে ধরনের বোরকা পরছো, তা মোটেই ইসলামী হিজাব নয়, পর্দার নামে এক ধরনের 'ফ্যাশন'। এ 'ফ্যাশন' তুমি যখন পরবে আর তোমার দেখাদেখি অন্য মেয়েরা পরবে, তাদের সবার গোনাহ তোমার আমলনামায় লেখা হবে। কেয়ামত পর্যন্ত। একটু ভেবে বলো তো, তুমি কি গোনাহর কাজে আদর্শ ও কারণ হতে চাও?

কার জন্যে সাজবে তুমি?!

এ ধরনের 'ফ্যাশন'মূলক হিজাব পরিহিতা কোনো মেয়ের কাছে তুমি যদি জানতে চাও–

'কেনো পরেছো তুমি এ 'আবা'?

সে তোমাকে বলবে–

'এটা সুন্দর তাই!'

তখন তুমি আবার তাকে জিজ্ঞাসা করো–

'কার জন্যে তোমার এ সুন্দর সাজ?'

উত্তরে ও বলবে–

'আমার এ-সাজ অভিজাত কোনো প্রস্তাবকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে কিংবা আমার স্বচ্চরিত্র স্বামীর জন্যে।'

আসলে কি তাই? মোটেই নয়। বরং এ অলংকৃত হিজাবে বের হলে এক ঝাঁক প্রবৃত্তি-তাড়িত লুলোপ দৃষ্টি তার দিকে তাকিয়ে থাকে আর মজা লুটে। অথচ আমার বোনেরা এই নিকৃষ্টদের চোখে নিজেদের রূপ প্রদর্শন করে আপ্লুত হয়। ভাবে– কেউ বুঝি আমাকে পছন্দ করলো!

সত্যিই বড়ো আফসোস হয়! এরা কারা জানো? যাদের চোখে পড়তে তুমি এতোটা ব্যাকুল, উন্মুখ?

আল্লাহর ভয়ে এদের হৃদয় কাঁপে না।

আল্লাহর বিধানের প্রতি এরা ভ্রূক্ষেপ করে না।

এরা নারীর সম্মান ও মর্যাদাও বোঝে না।

তার সতীত্ব ও পবিত্রতা এদের চোখের কাঁটা।

এরা এতোই নিকৃষ্ট যে, অবৈধ যৌনতার পাগলা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে নারীর সতীত্বের কোমল আঁচলের উপর দিয়ে সুযোগ পেলেই দাবড়ে বেড়ায়। নারীর দিকে তাকায় যৌনকাতর দৃষ্টিতে। এরপর যখন তারা নারীর সতীত্ব লুটে নেয়, তখন তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং খুঁজতে থাকে অন্য শিকার।

তুমি কি কখনো ভেবে দেখোছো– কেনো আল্লাহ তোমাকে হিজাবের বিধান মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। ভাবো নি আল কুরআনের এ আয়াত নিয়ে–

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

'তারা যেনো গ্রীবা ও বক্ষদেশ মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে এবং কারো নিকট নিজেদের আভরণ প্রকাশ না করে।'

একটু ভাবো, কেনো আল্লাহ তোমাকে তোমার সৌন্দর্য (চেহারা, চুল এবং সমস্ত শরীর) ঢেকে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন? কেনো আল্লাহ তোমাকে পর্দার নিদেশ দিয়েছেন? তোমার এবং আল্লাহর মধ্যে কোনো দুশমনি, বৈরিতা ও প্রতিশোধস্পৃহা তো নেই! আছে কি? নেই! আল্লাহ অভাবমুক্ত ও অমুখাপেক্ষী। বান্দার প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুমও তিনি করেন না। কিন্তু আল্লাহর শাশ্বত বিধান, সর্বযুগে কার্যকর তাঁর শরীয়ত, তাঁর অপরিবর্তনীয় বাণী, তাঁর ইনসাফপূর্ণ নীতি– পুরুষকে দিয়েছে যেমন কিছু স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা, নারীকেও দিয়েছে কিছু স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা। আল্লাহর হুকুম না মেনে পৃথিবীতে কারো টিকে থাকা সম্ভব নয়। এ জন্যেই সতী-সাধ্বী মহিলারা নিজেদের সম্মান ও মর্যাদা খোঁজে শুধু দ্বীনের আনুগত্যে .. আল্লাহর হুকুম পালনে।

এখন তোমার সামনে মুসলিম শরীফের একটি হাদীস উপস্থাপন করছি। হাদীসের ভাব ও মর্ম এবং শিক্ষা ও তাৎপর্য নিয়ে একটু ভাবো।

হযরত আয়েশা রা.-এর কাছে একদিন এক মহিলা এসে জিজ্ঞাসা করলেন–

'ব্যাপার কি বলুন তো, ঋতুবতী মহিলা ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হয়ে নামাজ কাজা না করে কেবল রোযা কাজা করে। এ ব্যবধান কেনো?'

হযরত আয়েশা তার প্রশ্নে আশ্চর্য হয়ে বললেন–

'তুমি কি দ্বীন মানো না?'

'অবশ্যই মানি। কিন্তু জানতে চাই।'

হযরত আয়েশা বললেন–

'আল্লাহর নবীর উপস্থিতিতে আমাদের সামনে এ-প্রশ্ন এলে আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয় রোযা কাজা করার এবং নামাজ কাযা না করার।'

হ্যাঁ, তোমাকেও দ্বীনের অনুসরণ করতে হবে এভাবেই। আল্লাহর হুকুমের সামনে করতে হবে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। আল্লাহ বলেছেন, তাই তুমি করবে। কেনো বলেছেন– এ প্রশ্ন করা যেমন অবান্তর তেমনি ধৃষ্টতা।

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

'মু'মিনদের বক্তব্য তো এই– যখন তাদের ভিতরে ফায়সালা করার সময় আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে তাদেরকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে– আমরা শুনলাম এবং মানলাম। আর তারাই সফলকাম। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকে, তারাই সফলকাম।'

হ্যাঁ, সফলকাম তারাই যারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে। আর যারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারীদের দলভুক্ত নয়, তারাই চায় তোমাকে অবগুণ্ঠনমুক্ত করতে। তোমার পর্দার সম্মান নষ্ট করতে। শুধু তাই নয়; ওরা লক্ষ্য অর্জনের জন্যে প্রয়োজনে জীবনকে বাজি রাখে। ধন-সম্পদ

উজাড় করে দেয়। অফুরন্ত সময় ব্যয় করে। এই দেখো না– অশ্লীল পত্র-পত্রিকা, যৌনোদ্দীপক লেখালেখি এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম, এ সবের লক্ষ্য একটিই। তা হলো পর্দাকে অসম্মান করা। পর্দার প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্বহীন ও অপ্রয়োজনীয় করে তোলা। এরা সব এক। সব শেয়ালের এক রা। এরা চায়– মু'মিনদের মাঝে অশ্লীলতার জীবাণু অনুপ্রবেশ করাতে। তুমি যখন বাইরে যাও, তখন তোমাকে, তোমার রূপকে দেখে দেখে ওরা কাম-দৃষ্টির জ্বালা মেটাতে চায়। তোমাকে নাট্যমঞ্চে ও নৃত্যমঞ্চে প্রদর্শন করে করে ওরা 'সুখ' পেতে চায়। তোমাকে অঙ্কশায়িনী করে প্রবৃত্তির মাতাল সুখে গা ভাসাতে চায়। ওরা শুধু জমিনেই তোমাকে ব্যবহার করতে চায় না, আকাশেও ব্যবহার করতে চায়। বিমানবালা বানায় নি ওরা তোমাকে? ঠেলে দেয় নি হিজাববিহীন 'ফ্যাশন'ময় পোষাকে– শুধু চোখের জ্বালা মেটাতে? শুধু তোমার রূপসুধা পান করতে? তোমার 'মুক্তাখচিত' দাঁতের মুচকি হাসির দিকে বেহায়ার মতো তাকিয়ে থাকতে?

সত্যিই বিস্মিত হতে হয়!

নারীর অধিকার বলতে ওরা কি শুধু–

পর্দাহীন বেলেল্লাপনাকেই বোঝে?

পুরুষের সাথে পাল্লা দিয়ে গাড়ি চালনাকেই বোঝে?

নিকটাত্মীয় ছাড়া যার তার সাথে ঘুরে বেড়ানোকেই বোঝে?

অফিসে-আদালদে ও শিল্প-কারখানায় পুরুষের পাশে অবাধ বলন-চলন-বসনকেই বোঝে?

প্রচার মাধ্যমে অংশ নেয়ার অবাধ প্রতিযোগিতাকেই বোঝে? শুধু এ গুলোই কি নারী-অধিকার? নারী-স্বাধীনতা?

নিপাত যাক আল্লাহর দুশমনদের এ-সব ইসলাম বিদ্বেষী চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণা। কই! একদিনও তো ওদেরকে বিধবা, অসহায় বৃদ্ধা কিংবা 'ওল্ড এজ হোম'-এর মজলুম অধিবাসীদের অধিকারের প্রশ্নে সোচ্চার হতে শুনি নি? কই! কোনো সন্তানকে তো ওরা কোনোদিন বলে নি–

'সাবধান! তোমার মা-বাবাকে 'ওল্ড এজ হোম'-এ পাঠিয়ে জ্যান্ত কবর দিও না! নাতি-নাতনীকে আদর-সোহাগ দেয়ার প্রাকৃতিক সুযোগ থেকে বঞ্চিত করো না!'

এরা আসলে সমাজ সংস্কারের নামে সমাজের ভিতরে পচন ধরাতে চায়। এরা মুনাফিক। আবদুল্লাহ বিন উবাই- এর নাতি-পুতি ও মানস-পুত্র। এই অভিশপ্ত 'আবদুল্লাহ' ছিলো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে মুনাফিকদের মাথা।

এসো, এখন একটু ইতিহাসের পাতা উল্টাই।

এই মুনাফিকরাই আম্মাজান আয়েশা রা.- এর চরিত্রে কালিমা লেপনের অপচেষ্টায় মেতে উঠেছিলো। বড়ো নিকৃষ্ট লোক ছিলো এই আবদুল্লাহ বিন উবাই। সে সুন্দর সুন্দর বাঁদী ক্রয় করে করে ওদেরকে পয়সার বিনিময়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য করতো। এরপর আল্লাহ কুরআনের আয়াত নাজিল করে তার মুখোশ খুলে দেন।

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.

'তোমাদের দাসীদেরকে তারা সততা রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের লোভ-লালসায় ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করো না।'

এই আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের বংশধররাই এখন আওড়ে যাচ্ছে–

'অবগুণ্ঠন তোমাকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ করে রাখবে। লম্বা বোরকা! সে তো অনেক ভারী ও বিরক্তিকর! প্যান্ট পরো, চলতে সুবিধে হবে। ওহ! চেহারা ঢেকে রাখতে কষ্ট হয় না? দম বন্ধ হয়ে আসে না?!'

এরা এমন এক সম্প্রদায়, যারা বিধর্মীদের সভ্যতা-সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী। আর এ সভ্যতা-সংস্কৃতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে তারা মনে করে হিজাবের 'উৎপাটন' এবং নারীদের কাপড় উপরে তোলাই একমাত্র পথ। পাশ্চাত্যের কিংবা প্রতীচ্যের কোনো দেশে কখনো সফরে গেলে এ-বাস্তবতা তোমার সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে। কোথাও দেখবে নারী বিমানবন্দরে কুলি-মজুরী করছে। কোথাও বা নারী পরিচ্ছন্নকর্মী। কোথাও

বা কোম্পানীর অধীনে বাথরুম পরিস্কার করছে। আর নারী একটু সুশ্রী হলে তাকে কাজে লাগানো হচ্ছে ভিন্নভাবে। বানানো হচ্ছে হয়তো নর্তকী নয়তো 'কলগার্ল'। তাকে নিয়ে খেলছে মদ্যমাতাল একদল মানুষ। কেউ বা তাকে বানাচ্ছে পণ্য। চাহিদা শেষ হয়ে গেলে কিংবা পণ্যমূল্য কমে গেলে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে– 'ডাস্টবিনে'।

বলো তো, এই কি নারী-স্বাধীনতা? এই কি নারীর সম্মান ও মর্যাদা? এই কি নারীর অধিকার? যার শ্লোগানে মুখর পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বজাধারীরা? ঐ ফিলিপাইনে কিংবা এই কাশ্মিরে কোনো মা-বোন নিপীড়িত হলে আমি তুমি একটু-আধটু বেদনাক্রান্ত হলেও সে দেশে নারী কি পায়– তার পাশে কোনো বেদনার্ত হৃদয়?

তুমি সুন্দর চাও?

তাহলে মনে রাখবে– আল্লাহ্র নাফরমানী ও অসন্তুষের ভিতরে নেই কোনো সৌন্দর্য। প্রকৃত সৌন্দর্য পাবে তুমি শুধু আল্লাহ্র বিধানে, তাঁর হুকুম পালনে। সৌন্দর্যের পূর্ণ ছবিটা অবশ্য তুমি এখানে, এই পার্থিববাসে পাবে না। তা পাবে শুধু জান্নাতে। শুধুই জান্নাতে। পূর্ণ রূপে, পূর্ণ ছবিতে, পূর্ণ অবয়বে। দেখবে তখন তা চোখ ভরে। ভোগবে তখন তা মন ভরে। জান্নাতের হুরদের কথা শুনেছো? এই হুরদের সাথে তোমার কোথাও কোথাও কিন্তু মিল রয়েছে, জানো সে কথা? হুরদের যদিও রাত জেগে জেগে ইবাদত-বন্দেগী করতে হয় না এবং দিবসে কষ্ট করে করে রোজা রাখতে হয় না, কিন্তু তাদের নেই প্রবৃত্তির তাড়না । নেই যৌবনের উম্মাদনা। এবার হুরদেরকে পাশে রেখে তুমি নিজেকে একটু বিশ্লেষণ করো।

কতো বিনিদ্র রাত কেটেছে তোমার– আল্লাহ্র ইবাদত-বন্দেগী ও স্তুতি-বন্দনায়। তিনি শুনেছেন তোমার অশ্রুস্বজল প্রার্থনা। দিয়েছেন তোমার কাতর ডাকে সাড়া। শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যে তুমি ত্যাগ করেছো আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাস। প্রবৃত্তি তোমাকে ডেকেছে বারবার, অনেকবার– প্রতিবারই তুমি সাফ বলে দিয়েছো– 'না!, আমি আসবো না! তোমার অসঙ্গত আহ্বানে সাড়া দেবো না!'

তাহলে কী বুঝলে, কী দেখলে? তুমি যে এখানে সাধনায়-ত্যাগে জান্নাতের হুরকেও হার মানিয়েছো– তা কি বুঝতে পেরেছো? ওদের তো প্রবৃত্তিই নেই, তাহলে তার তাড়না আসবে কোত্থেকে? তোমার প্রবৃত্তি ছিলো, তার আকর্ষণীয় আবেদন ছিলো, তার লোভনীয় ফাঁদ ছিলো, তবু তুমি বলে দিয়েছো– 'না! না!! না!!!', তাহলে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ! তুমিই তো সুন্দর! তুমিই তো রানী!! জান্নাতের প্রবেশদ্বারে ফেরেশতারা যদি তোমাকে স্বাগত জানায়, তাহলে কেনো অবাক হবে তুমি?

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

'আল্লাহ মু'মিন নর-নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের– যার তলদেশে ঝরনাসমূহ প্রবাহিত হবে, যেখানে তারা স্থায়ী হবে– এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসস্থানের। আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তাই মহা সাফল্য।'

তুমি রানী, তুমিই রানী।

এক ডাক্তারের ভাষ্য–

'আমি বৃটেনে পড়াশুনা করতাম। আমার এক প্রতিবেশিনী ছিলেন। বয়স সত্তরের উপরে। যে-ই তাকে দেখতো, তার চোখেই সহানুভূতি ঝরতো। পিঠ তার ন্যুব্জ হয়ে গেছে। হাড্ডিও নরম হয়ে গেছে। শরীরের চামড়া ঝুলে পড়েছে। তবুও তিনি থাকতেন একা একা– চার দেয়ালের ভিতরে। দেখতাম তিনি কখনো বেরুচ্ছেন। কখনো প্রবেশ করছেন। সাথে স্বামী-পুত্র কেউ নেই। নিজের খাবার নিজেই পাকাচ্ছেন। নিজের কাপড়ও নিজেই ধুইছেন। বাড়িটিতে যেনো কবরের ছায়া বিরাজ করছে। তিনি ছাড়া কারো আনাগোনা চোখে পড়ে না। কেউ এসে তার দরোজায় কড়াও নাড়ে না। একবারের জন্যেও তার কোনো সন্তান এসে বলে না–

'মা! দুয়ার খোলো! আমি তোমার জন্যে খাবার পাকিয়ে এনেছি! এসো এক সঙ্গে বসে খাই!'

একদিন আমার স্ত্রী তাকে আমাদের বাসায় বেড়াতে অনুরোধ করলো। তিনি এলেন। আমার স্ত্রী কথায় কথায় তাকে বললো–

'ইসলামে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও দেখাশুনার দায়িত্ব স্বামীর। স্ত্রীর আরামের জন্যে স্বামী বাইরে কাজ করেন। রুজি-রোজগার করেন। খরিদ করেন স্ত্রীর খাবার ও পোষাক। স্ত্রী অসুস্থ হলে তার উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন স্বামীই। স্ত্রীর প্রয়োজন ও সমস্যায় এগিয়ে আসার দায়িত্বও স্বামীরই।

স্ত্রী ঘরে বসে ঘরের কাজ করবেন। স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও ইজ্জত-আব্রু থেকে শুরু করে সবকিছুর হেফাজত করবেন স্বামী।

স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্ম নিলে সে সন্তানও বড় হয়ে মা'র আনুগত্য করতে বাধ্য। যদি তার কোনো সন্তান তার সাথে বে-আদবী ও অন্যায় আচরণ করে, তাহলে ইসলামী সমাজ তাকে বয়কট করবে, দূরে সরিয়ে দেবে– যতোক্ষণ না সে মায়ের আনুগত্যে ফিরে আসবে।

স্বামী না থাকলে নারীর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব বর্তাবে বাবা কিংবা ভাই কিংবা অভিভাবকের উপর।'

বৃদ্ধ মহিলাটি উৎকর্ণ হয়ে আমার স্ত্রীর কথাগুলো শুনছিলেন। তার চোখে-মুখে বিস্ময় ও মুগ্ধতার ছাপ খেলা করছিলো। বরং তিনি এ-সব শুনতে শুনতে ভীষণ প্রভাবিত হয়ে উদগত অশ্রু নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছিলেন। তার মনে পড়ে গেলো নিজের প্রিয় সন্তানদের কথা। নাতি-নাতনের কথা। যাদেরকে অনেক দিন তিনি দেখেন না। এমন কি জানেনও না তিনি– তারা কে কোথায়? একদিন তিনি মারা যাবেন। তাকে দাফন করা হবে কিংবা আগুনে পোড়ানো হবে। তখন কেউ-ই তার মৃত্যু সংবাদ পাবে না। তাকে দেখতে আসবে না। শেষ বিদায় জানাতে আসবে না। তার জন্যে একটু অশ্রুও ফেলবে না– কাছে এসে কিংবা দূরে বসে! কারণ, তাদের কাছে তার কোনো মূল্য নেই। তিনি এখন বৃদ্ধা, কাজের অযোগ্য।

আমার স্ত্রী কথা শেষ করলো। বৃদ্ধাটি কিছুক্ষণ নীরব ও স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। তারপর মাথা তুলে বললেন–

'সত্যিই, সত্যিই তোমাদের ধর্মে নারীরা রানী! হ্যাঁ, এই যে তুমি আমার সামনে বসে আছো, আমাকে তোমাদের গল্প বলছো– তুমিও একজন রানী! তোমার জন্যে রক্ত দেয়ার লোক আছে। তোমার সম্মান বাঁচানোর কিংবা তোমার জন্যে জীবন বিলানোর লোক আছে। তোমার এক প্রাণ বাঁচানোর জন্যে শত শত প্রাণ ও অঢেল ধন-সম্পদ বিলিয়ে দেয়া– কিছুই না! কেননা, তুমি রানী! সংরক্ষিত তোমার আসন ও অবস্থান। স্বামী কিংবা ভাই কিংবা অভিভাবক নিরাপত্তা বেষ্টনী খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে তোমার নিরাপত্তায়। ধন্য তুমি হে মুসলিম নারী! ধন্য তুমি হে মুকুটবিহীন সম্রাজ্ঞী!!

সুরলহরী ও বেদনাপুঞ্জ

শয়তান কোনো কোনো তরুণীকে নিয়ে যায় পাপের পথে। গান-বাদ্যের অন্ধকার জগতে। অশ্লীল জগতে। আল্লাহ বলেছেন–

> وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ.
>
> 'মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্র পথ থেকে (অন্যকে) বিচ্যুত করার জন্যে অসার বাক্য ক্রয় করে এবং আল্লাহ্র বাতানো পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এদের জন্যে রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।'

ইবনে মাসউদ রা. কসম খেয়ে বলতেন– لهو الحديث মানে হলো– 'গান-বাজনা'।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

> ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف
>
> 'আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোক আযাদ নারীকে বাঁদীর মতো হালাল মনে করবে। আরো হালাল মনে করবে রেশমী কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে।'

তিরমিযী শরীফে এসেছে–

" ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ وذلك إذا
شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف "

'এই উম্মতের ভিতরে জেঁকে বসবে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা, দোষারোপ ও বিকৃতি– যখন তারা অবাধে মদ পান করবে, গায়িকা নিয়ে মেতে থাকবে এবং বাদ্যযন্ত্র বাজাবে।'

উলামায়ে কেরাম স্পষ্ট ভাষায় অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, বাদ্যযন্ত্র হারাম। বিশেষত বাজনা আর গান যখন এক সঙ্গে হবে, তখন গোনাহ বেশী হবে এবং 'হুরমত' বেশী শক্ত হবে। আর গানের কথা ও বাণী যদি হয় অবৈধ-প্রণয়মুখী এবং নারী সৌন্দর্যের বর্ণনায় বা অশ্লীলতায় আচ্ছন্ন, তাহলে এমন গান-বাদ্যকে কঠোর ভাষায় ইসলামী শরীয়তে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। বরং তা শয়তানের বাজনা। যা শয়তান বাজায় আর তা শুনে শুনে তার অনুসারীরা লাফায়। আল্লাহ বলেছেন–

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ
بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ.

'তাদের মধ্য থেকে যাকে পারো ডেকে পদস্খলিত করো এবং তাদেরকে আক্রমণ করো তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে।'

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন–

'গান-বাজনা হলো ব্যভিচারের সম্মোহন (অর্থাৎ ব্যভিচারের প্রতি আকৃষ্ট ও প্রলুব্ধ করার কারণ ও মাধ্যম)।'

আশ্চর্য! হযরত ইবনে মাসউদ যখন এ কথাটি বলেছেন তখন শুধু 'দফ'-এর সাহায্যে গান গাইতো– দাসী-বাঁদীরা। কিন্তু এখন? এখনকার গান ও তার ভাষা এবং এখনকার বাজনা ও তার রকমারী বাহার ও বৈচিত্র আর পাশাপাশি গায়িকাদের রূপ প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা ও শরীর প্রদর্শনের উৎকট মানসিকতা দেখলে তিনি কী বলতেন?

হায়! এ পাপময় 'সংস্কৃতি' এখন সর্বত্র কী দাপটের সাথেই না বিরাজ করছে! গাড়িতে-উড়োজাহাজে-জলে-স্থলে– সর্বত্র। এমন কি ঘড়িতে, ঘড়ির এলার্মে, শিশু-খেলনায়, কম্পিউটারে এবং ফোনে-মোবাইলে ঢুকে পড়েছে– 'মিউজিক' ও সঙ্গীত।

সবচে' বেদনাদায়ক সত্য হলো– এ-সব কর্মকাণ্ড মানুষের কাছে মূল্যায়িত হচ্ছে। মানুষ বলছে অবলীলায়–

'আমাদের সংস্কৃতির অনেক উন্নতি হয়েছে। আমরা অগ্রগতির অনেক পথ মাড়িয়ে এসেছি!'

হায়! হারাম ও অবৈধ জিনিসকে যখন এমন অকপটে 'মুসলিম' পরিচয়দানকারী কিছু মানুষ নিজের সংস্কৃতি বলে গর্ব করে, তখন কান্না ছাড়া আর উপায় কী? আল্লাহ্ করেছেন হারাম আর আল্লাহর বান্দা সেই হারামকেই ঘোষণা করছে নিজের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ– সংস্কৃতি হিসাবে! এরা সংস্কৃতি কি শুধু হারাম জিনিসেই খুঁজে পায়? হালাল জিনিস চোখে পড়ে না? নাকি অন্য কোনো বদ মতলবে এরা হারাম নিয়ে বেসাতি করে বেড়ায়? নারীকে মঞ্চে তোলে নাচায়? গাওয়ায়? দোলায়? কসরত করায়? ধিক, শত ধিক এ সংস্কৃতিকে!!

ব্যভিচারের সম্মোহন

গান হলো অশ্লীলতা ছড়ানোর এবং মানুষের কু-প্রবৃত্তিকে উস্কে দেওয়ার একটি মাধ্যম। বর্তমানে অধিকাংশ গানের কথা ও বাণী আসলে কী? কেবল প্রেম-ভালোবাসা। প্রেমের বেসামাল ডাকে সাড়া দিয়ে নিশ্চিত অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া। ঠিক করে বলো তো! এমন কণ্ঠশিল্পী ক'জন খুঁজে পাবে তুমি, যারা ব্যভিচার কিংবা পরপুরুষ কিংবা পরনারীর রূপ-দর্শন থেকে বেঁচে থাকার জন্যে সতর্কতা অবলম্বন করেছে? কিংবা মুসলমানদের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রুর হিফাযতের জন্যে চেষ্টা করেছে? অথবা মানুষকে দিনের বেলা রোজা রাখার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছে? আর রাতের বেলা অশ্রু ঝরিয়ে আল্লাহর দরবারে কাঁদতে বলেছে? না! আমরা কখনো এমনটি শুনি নি। বরং এই কণ্ঠশিল্পীদের অধিকাংশই গানের মাদকতা-ছড়ানো সুর-সঙ্গীতে এবং প্রবৃত্তিকে উস্কে-দেয়া নাচের ঝংকারে

মানুষকে, সবুজমতি তরুণ-তরুণীদেরকে অবৈধ ভালোবাসার দিকে ঠেলে দেয়। মঞ্চে নৃত্যমাতাল অঙ্গভঙ্গি করে করে যুবক যুবতীদের মাঝে অনৈতিকতার জীবাণু ছড়িয়ে দেয়। তাদের হৃদয়-মনকে জুড়ে দেয় আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর সাথে। বরং কখনো কখনো এ কণ্ঠশিল্পীরা এর চেয়েও আরো ভয়ঙ্কর মহা বিপদের দিকে ওদেরকে টেনে নিয়ে যায়। আর সেটা হলো– সমকামিতা। নারীর সাথে নারীর। নরের সাথে নরের।

কেনো ভালেবাসে নারী নারীকে?

এ জন্যে নয় যে, সে রাত জেগে জেগে তাহাজ্জুদ পড়ে।

দিবসের কষ্টে-গরমে-ক্ষুৎপিপাসায় রোজা রাখে।

বরং নারী নারীকে 'ভালোবাসে'–

নারীর রূপ-ঝলকের মোহময়তার জন্যে।

তার রূপ ঝরানো দিল ভোলানো হাসির জন্যে।

তার মোহনীয় অঙ্গভঙ্গির জন্যে।

তার ডাগর চোখের গভীর ভাষায় ডুব দেওয়ার জন্যে।

তার সঙ্গ-সুখের পাপ-বেষ্টনীতে সময় 'নষ্ট' করার জন্যে।

কোনো কোনো তরুণী এ সব বিষয়ে ভীষণ উদার হয়। নিজেরাই দাবি করে– 'এ আমাদের অধিকার!'

হ্যাঁ, বড়ো আশঙ্কাজনকভাবে এমন নারীদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। স্বভাবে এরা চপল তরল। এই হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ছে। এই চলতে চলতে এলিয়ে পড়ছে। মুখে হাসি-জড়ানো চটুল কথা। পায়ে দৃষ্টিকাড়া চপল-চলা। পরনে গায়ের সাথে লেপটে থাকা আঁটসাট 'শর্ট' জামা। এর সাথে ওর সাথে– মান-অভিমান ও ছল করা। কখনো গভীর ফিসফিসানি, দৃষ্টিকটু মাখামাখি। কখনো আবেগঘন চিঠির কাতর করা ভাব-বিনিময়। কখনো বা শয়তানী সব উপহার-বিনিময়। এ সব চোখে পড়ে প্রায় সবখানেই এখন। এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও। 'আদর্শ নাগরিক' বানানোর কারখানাতেও।

কেনো ওরা অমন করে? অন্য মানুষের হৃদয়ে মুগ্ধতার আবেশ ছড়াতে। ছল করে করে অন্য মানুষকে মায়ায় জড়াতে। ভালোবাসার নামে

জীবাণুযুক্ত প্রেমের আবিলতায় অন্যকে আবিল করতে। নিঃসন্দেহে এ-সব আচরণ প্রকৃতি বিরুদ্ধ ও প্রবৃত্তি তাড়িত। এ সব আচরণে ত্বরান্বিত হয়- আসমানী আযাব। যেমন ত্বরান্বিত হয়েছিলো কওমে লূতের উপর।

জানো, কী করেছিলো কওমে লূত? পুরুষ (যৌন)তৃপ্তি খুঁজেছিলো এই পুরুষকে নিয়ে। নারীও নারীকে নিয়ে। লক্ষ্য করো কুরআনের ভাষা-

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ.

'তোমরা কি এমন কু-কর্ম করছো- তোমাদের পূর্বে পৃথিবীতে আর কেউ যা করে নি?'

এ ধরনের কু-কর্ম যখন সংঘটিত হয়, তখন পৃথিবী দুলে উঠে। পাহাড় স্থানচ্যুত হয়ে যায়। এ কু-কর্মের জন্যে আল্লাহ কওমে লূতকে যে কঠিন ও ভয়াবহ শাস্তি দিয়েছেন, অন্য কোনো সম্প্রদায়কে তা দেন নি। তাদেরকে অন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো। মুখমণ্ডল কালো করে দেওয়া হয়েছিলো। হযরত জিবরীল আমীনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো- তাদের জনপদকে উল্টে দাও। তদেরকে মাটি-চাপা দিয়ে ধ্বংস করে দাও। তারপর সেখানে পাথর-বৃষ্টি বর্ষন করো। আল্লাহ বলেন-

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ.

'অতপর যখন আমার আদেশ এলো, তখন আমি জনপদকে উল্টে দিলাম এবং তাদের উপর ক্রমাগত প্রস্ত র কঙ্কর বর্ষন করলাম।'

লূত আ.-এর কওমের এ শাস্তিকে আল্লাহ জগতবাসীর জন্যে নিদর্শন, মুত্তাকীদের জন্যে শিক্ষনীয় ঘটনা এবং পাপাচারীদের জন্যে দৃষ্টান্তমূলক দণ্ড বানিয়েছেন। নিশ্চয়ই এতে রয়েছে পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্যে নিদর্শন। এ-বিপদ যখন তাদেরকে গ্রাস করে তখন তারা ছিলো 'নিদ মহলার বাসিন্দা'। তাদের এ অস্থায়ী নিদ- রূপ নিলো চিরস্থায়ী নিদে। জীবনের কোনো অর্জনই তখন তাদের কোনো কাজে এলো না। নিমিষেই চলে গেলো সব স্বাদ-আহলাদ ও ভোগ-বিলাস। কু-প্রবৃত্তির অবাধ স্বাধীনতায় এখন তাদের সকালও কাটে না, সন্ধ্যাও কাটে না।

সামনে শুধু অন্ধকার। শুধু আক্ষেপ। শুধু আযাব।

ভোগ-বিলাস– মাত্র কয়েকদিন!

আল্লাহর শাস্তি– অনন্তকাল!

বেদনাদায়ক পরিণতি– অবশ্যম্ভাবী!

অনুশোচনা? না, এখন তা কোনো কাজে লাগবে না। কান্নাও কোনো কাজে লাগবে না। অশ্রুকান্না তো দূরের কথা, রক্তকান্নাও এখন কোনো কাজে লাগবে না। জাহান্নামের আগুনে এখন তাদেরকে ঝলসানো হবেই। তাদের নাকে-মুখে জাহান্নামের আগুন বের হবেই। জাহান্নামের দুর্গন্ধযুক্ত 'পানীয়' পান করতে তাদেরকে বাধ্য করা হবেই। তাদেরকে বলা হবেই– 'চাখো যা তোমরা দুনিয়ায় বসে কামাই করেছিলে।'

> إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون.
>
> 'প্রবেশ করো জাহান্নামে। ধৈর্য ধরো আর না ধরো– উভয়ই বরাবর। তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল ভোগ করতে হবে।'

এ কর্মফল জালিমদের কাছ থেকে বেশী দূরে নয়।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

> إن أخوَفَ ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط
>
> 'আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে সবচে' বেশী আশঙ্কা করি কওমে লূতের কুকর্মের।' -তিরমিযী

> لعن الله من عمل عمل قوم لوط.. لعن الله من عمل عمل قوم لوط.. لعن الله من عمل عمل قوم لوط
>
> 'যে ব্যক্তি কওমে লূতের কু-কর্মে লিপ্ত হয় তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। যে ব্যক্তি কওমে লূতের কু-কর্মে লিপ্ত হয় তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। যে ব্যক্তি

কওমে লূতের কুকর্মে লিপ্ত হয় তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।' - সহীহ ইবনে হাব্বান

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به

'কওমে লূতের কুকর্মে যাকে তোমরা লিপ্ত দেখতে পাবে, কুকর্মকারী এবং কুকর্মকৃত– উভয়কেই হত্যা করো।' - মাসনাদে আহমাদ

সাহাবায়ে কেরাম সমকামীদেরকে পুড়িয়ে শাস্তি দিতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন–

اللوطي إذا مات من غير توبة مسخ في قبره خنزيراً

'সমকামী তাওবা ছাড়া মারা গেলে কবরে শোকরে পরিণত হয়।'

সুতরাং যারা এ সব কুকর্মে লিপ্ত হয়ে নিজেদের প্রতি সীমাহীন জুলুম করেছে, তাওবা ও ইস্তেগফার করে এক্ষুণি তাদের পরিশুদ্ধ নতুন জীবনে ফিরে যাওয়া উচিত। ফিরে এলে আল্লাহ ফিরিয়ে দেবেন না। তিনি যেমন পরাক্রমশালী তেমন গাফ্ফার। মহা ক্ষমাশীল।

হ্যাঁ, তোমাকে হে নারী বিশেষভাবে আমি তাওবা করার আহ্বান জানাচ্ছি। তাওবা করো আল্লাহর কাছে। কুটি কুটি করে ছিড়ে ফেলো– 'ওদের' সব চিঠি, সব নম্বর। ধ্বংস করে দাও পাপ জগতের সব ছবি, ক্যাসেট ও 'সিডি-ভিসিডি'। প্রমাণ দাও– অন্য কারো প্রতি নয়, শুধু রাহমান-এর প্রতিই তোমার সব ভালোবাসা। শয়তানের আনুগত্য নয়– আল্লাহর আনুগত্যই তোমার জীবনের একমাত্র চাওয়া-পাওয়া।

কোথায় সেই অসহায়া?

কুরআনের তিলাওয়াত শুনতে যার মন অনাগ্রহী, অথচ গান-বাজনায় অতি উৎসাহী, তাকে বলতে চাই– আল্লাহর আযাব তোমাকে গ্রাস করবে।

জান্নাতে গিয়ে গান শোনার মহা সৌভাগ্য ও সুযোগ থেকেও তুমি চির বঞ্চিত হবে।

কুরআনের তিলাওয়াত তোমার জন্যে যথেষ্ট হবে না বরং এর পরিবর্তে গান-বাজনা নিয়ে সারাবেলা মেতে থাকবে– এটা বড়ো খারাপ কথা। মুহাম্মদ ইবনে আল-মুনকাদির বলেছেন–

'কেয়ামতের দিন এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে– 'কোথায় ওরা, যারা গান-বাজনা ও বিনোদনের আসর থেকে নিজেদের কানকে বাঁচিয়ে রেখেছিলো? ওদেরকে ঠিকানা গড়ে দাও আজ মেশক-আম্বরের উদ্যানে।'

এরপর আল্লাহ্ ফেরেশতাদেরকে বলবেন–

'ওদেরকে শোনাও আমার মহিমা ও স্তুতিগান।'

শহর ইবনে হাওশাব থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্ তাঁর ফেরেশতাগণকে বলবেন–

'আমার বান্দারা দুনিয়াতে মিষ্টি কণ্ঠ ভালোবাসতো। আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে (আমার স্তুতি-গাওয়া কথা ও বাণী) তারা শুনতো। আজ তোমরাও তাদেরকে শোনাও– আমার মহিমাগাথা ও স্তুতিগান!!'

তখন ফেরেশতারা আল্লাহ্র মহিমাকীর্তন ও স্তুতিগানে মুখর হয়ে উঠবে। এমন কণ্ঠে ও এমন সুরে, যা কোনোদিন কোথাও তারা শুনে নি!'

মারলো কে আর মরলো কে!!

প্রিয় বোন আমার!

যখন আমি তোমাকে এ সব লিখছি, তখন আমি নিশ্চিতভাবেই ধরে নিচ্ছি– তুমি এ-সব কর্ম থেকে মুক্ত ও পবিত্র। আমি জানি– তুমি গান শোনো না। আমি জানি– তুমি অশ্লীল কাজ-কর্মে লিপ্ত নও। তবে তোমাকে বলছি এ জন্যে যে, তুমি যেনো অন্যকে বলতে পারো। অন্যকে ফেরাতে পারো। সৎকর্মে নির্দেশনা দিতে পারো আর অন্যায় কর্মে বাধা দিতে পারো। যেনো তুমি বীরাঙ্গনা হতে পারো। কখনো যেনো শয়তান তোমার কাছে ভিড়তে না পারে। ভয় দেখাতে না পারে। নারীর বীরত্বের কাহিনী শোনো–

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর এক ফুপুর নাম সাফিয়্যা। তিনি ইসলাম কবুল করে ধন্য হয়েছিলেন। খন্দক যুদ্ধের কাহিনী। তখন হযরত সাফিয়্যা রা.-এর বয়স ষাট ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু তখনো তিনি বিস্ময়কর বীরত্বের নায়িকা।

আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে সম্মিলিত আরব বাহিনী মদীনা ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে ঘিরে ফেলেছে মদীনা। ওদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নেতৃত্বে সাহাবায়ে কেরাম পরিখা খনন করেছেন- মদীনার অরক্ষিত দিকগুলোতে। মুসলমানরা জনবলে হীনবল। তাই আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিখার তীরে সকল সাহাবীকে হাজির থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে পরিখা ভেদ করে দুশমনের মদীনা-প্রবেশের যে কোনো চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়া যায়।

মহিলা ও শিশুদেরকে নবীজী একটা মজবুত কেল্লায় জড়ো করলেন। কিন্তু লোকবলের অভাবে সেখানে কোনো পুরুষ-পাহারা বসানো সম্ভব হলো না।

একদিন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সাহাবীদেরকে নিয়ে পরিখার কাছে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন, তখন একদল ইহুদী গোপনে ঢুকে পড়লো দুর্গের একেবারে নিকটে- মহিলাদের অবস্থানের কাছে। দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করার সাহস পেলো না, পুরুষ আছে- এই আশঙ্কায়। কিন্তু দুর্গের বাইরে তারা কাতারবন্দি হলো। একজনকে পাঠালো- ভিতরে কী অবস্থা- সে তথ্য সংগ্রহের জন্যে। প্রেরিত ইহুদীটা দুর্গের আশ্-পাশে ঘুরতে লাগলো। হঠাৎ একটা ছোট্ট সুড়ঙ্গ দেখতে পেয়ে সে ভিতরে ঢুকে পড়লো। ভিতরে এসে সতর্ক দৃষ্টি মেলে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো। হযরত সাফিয়্যা তাকে দেখে ফেললেন। আতঙ্কিতও হলেন। কিন্তু মনে মনে ভাবলেন-

'এই ইহুদীটা যেভাবেই হোক কেল্লায় ঢুকে পড়েছে। চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে ওর মতলব খারাপ। আমি চাই না, ও এখান থেকে ফিরে গিয়ে আমাদের সব কথা অন্য ইহুদীদেরকে বলে দিক। এদিকে নেই কোনো পুরুষ। সবাই পরিখার পাড়ে যুদ্ধ-ব্যস্ত। এই অবস্থায় আমি যদি নিজে আতঙ্কগ্রস্ত হই এবং তা প্রকাশ করি ও চীৎকার দিই, তাহলে বিপদ দু'টি। একটি হলো- বাকি নারী-শিশুরা ঘাবড়ে যাবে। চীৎকার শুরু করে দেবে।

ইহুদীটা বুঝে ফেলবে যে, দুর্গে কোনো পুরুষ নেই। তাহলে বিপদ আরো ঘনীভূত হবে।'

হযরত সাফিয়্যা এ-সব ভাবতে ভাবতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। নিজের করণীয় ঠিক করে ফেললেন। একটা ধারালো ছুরি নিয়ে বাঁধলেন তা দেহের সঙ্গে। এরপর নিলেন গাছের একটা লম্বা ডাল। তারপর নেমে এগিয়ে গেলেন ইহুদীটার দিকে। চলে গেলেন একেবারে কাছে। তারপর সুযোগের অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে থাকলেন একটু আড়ালে। সুযোগ যখন এলো তখন 'মুসলিম নারী'র ডালের আঘাতে ধরাশায়ী হয়ে গেলো 'ইহুদী নর'। আঘাতটা লেগেছিলো মাথার ঠিক মধ্যখানে– মস্তক বরাবর উপরে, তাই দমটা বেরুতে আর সময় লাগলো না!

'সাফিয়্যা!

হে মহিয়সী নারী!

ধন্য আপনি ধন্য!!

পৃথিবীর নারীদের জন্যে আপনি রেখে গেলেন–

ত্যাগের যে নমুনা এবং বীরত্বের যে মহিমা,

তা চিরকাল মুসলিম নারীদেরকে পথ দেখাবে–

আলোর পথ,

ত্যাগের পথ।

দ্বীনের তরে সবকিছু এমনকি জানটাও বিলিয়ে দেয়ার পথ।'

বলো তো, মহিয়সী সাফিয়্যা রা.-এর কাহিনী থেকে তুমি কী পেলে? কী শিখলে? এবার প্রশ্ন করো মনকে–

হে মন!

দ্বীনের পথে তুমি কী করেছো?

কী বিলিয়েছো?

ব্যয় করেছো কি শ্রম ও সাধনা?

দিয়েছো কি কখনো রক্তের নজরানা?

সৎ কাজের আদেশে কেটেছে তোমার ক'বেলা?

নাকি নাফরমানিতেই কাটিয়ে দিয়েছো সারাবেলা?

ঐ যে রাস্তায় হেঁটে যেতে দেখছো 'সল্ল-ভ্র-নারী'দের,

কিংবা মার্কেটে মার্কেটে ঘুরে বেড়ানো ঐ স্বল্প-ভূষণা বে-আব্রুদের,

অথবা বিবাহ-অনুষ্ঠানের প্রায় বসনমুক্ত এই যুবতীদের–

তখন তুমি কী করেছো?

তাদের প্রতি তোমার যে দায়িত্ব, তা কি পালন করেছো?

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

'মু'মিন নর-নারীরা একে অপরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে। সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে। আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করে। তাদেরকেই আল্লাহ কৃপা করবেন। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

সৎ কাজের আদেশ আর অন্যায় কাজের নিষেধ পরিত্যাগ করে যারা, তাদের উপর আল্লাহ অভিসম্পাত করেন।

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.

'বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরি করেছিলো তারা দাউদ ও মারইয়াম তনয় কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিলো– এই কারণে যে, তারা ছিলো অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। তারা যে সব গর্হিত কাজ করতো, তা থেকে একে

অন্যকে বারণ করতো না। তারা যা করতো তা কতোই না নিকৃষ্ট!'

সুতরাং দাওয়াতের ময়দানে নামতে কিংবা নেমে লজ্জাবোধ করো না। দাওয়াতের ময়দানের সূচনায় ত্যাগ ও কষ্ট এবং সাহস ও বীরত্বের প্রশ্ন থাকলেও শেষটা বড়ো আনন্দের ও মিষ্টির। জ্বলতে জ্বলতে এবং পুড়তে পুড়তেই পাওয়া যায় স্বাদ– সেই মিষ্টির, সেই আনন্দের!

নববধূ!

'যতোই আসুক বাধা, থাকবো আমি ঈমানের সঙ্গে বাঁধা। যখন আসবে ডাক– ঈমানের-জিহাদের-আনুগত্যের-রক্তদানের, তখন আমি নিঃশঙ্ক কণ্ঠে বলবো– 'লাব্বাইক। আমি হাজির।'

এই মনোভাব ও চেতনা লালন করে যে সকল নারী– ধন্য তারা ধন্য! এমন নারী-চরিত্র ইসলামের ইতিহাসে অসংখ্য। আমরা এখন এমন একজনের কথাই আলোচনা করবো সংক্ষেপে। তিনি এক মহিয়সী সাহাবিয়্যা। সতী-সাধ্বী ও অভিজাত। নববধূ!

এক সাহাবী, নাম জোলাইবিব। দেখতে মোটেই সুদর্শন নয়। সুন্দর মানুষকে যদি তুমি বলো– 'সুদর্শন', তবে তাঁকে বলতে হবে ঠিক তার উল্টোটি। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বিবাহ করিয়ে দেয়ার প্রস্তাব দিলেন। হযরত জোলাইবিব রা. তখন বললেন–

'কিন্তু (হে আল্লাহর রাসূল!) যদি দেখতে পান যে, কেউ আমাকে পছন্দই করছে না!'

'আল্লাহর নিকট মোটেই তুমি পছন্দহীন নও।'

এরপর থেকেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জোলাইবিব রা.-এর বিবাহের সুযোগ খুঁজছিলেন। একদিন তাঁর খিদমতে এক আনসার সাহাবী এসে তাঁর এক অকুমারী মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করে দেয়ার আবদার পেশ করলেন। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–

'তোমার মেয়েকে আমার কাছে বিবাহ দিয়ে দাও!'

সাহাবীটি আনন্দঘন কণ্ঠে বললেন–

'অবশ্যই হে আল্লাহ্‌র রাসূল!'

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–

'আমি নিজের জন্যে বলছি না।'

সাহাবীটি বললেন–

'তাহলে কার জন্যে হে আল্লাহ্‌র রাসূল!'

'জোলাইবিবের জন্যে!'

'জোলাইবিব! হে আল্লাহ্‌র রাসূল? তাহলে আমি মেয়ের মা'র সঙ্গে একটু কথা বলে আসি!'

তখন লোকটি স্ত্রীর কাছে এসে বললেন–

'আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার মেয়েকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছেন।'

স্ত্রী বললেন–

'উত্তম প্রস্তাব! অবশ্যই এ প্রস্তাবে আমাদের সাড়া দেওয়া উচিত।'

স্বামী বললেন–

'কিন্তু তিনি নিজের জন্যে এ প্রস্তাব দেন নি'

'তাহলে কার জন্যে?'

'জোলাইবিবের জন্যে!'

'কী! জোলাইবিবের জন্যে? না, এ হয় না! আমি জোলাইবিবের কাছে মেয়ে বিবাহ দেবো না! এমন কতোজনকেই তো আমরা 'না' বলে দিয়েছি!'

মেয়েটির আব্বা মায়ের অমতে বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন এবং চিন্তিত মনেই আল্লাহ্‌র নবীকে 'মায়ের অমত' জানাতে উঠে দাঁড়ালেন। তখন মেয়েটি পর্দার আড়াল থেকে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলো–

'আপনাদের নিকট কে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন?'

তারা বললেন–

'আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম!'

'আপনারা কি আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে যাচ্ছেন? এ হতে পারে না! কিছুতেই না!! আমাকে নিয়ে চলুন তাঁর কাছে! তিনি আমাকে 'নষ্ট' করবেন না!!'

তখন বাবা গেলেন নবীজীর কাছে। বললেন তাঁকে নিজের কথা, মেয়ের কথা। মেয়ের স্পষ্ট উচ্চারণের কথা। আল্লাহ্র নবী খুব খুশি হলেন এবং তাঁকে হযরত জোলাইবিবের সাথে বিবাহ পড়িয়ে দিলেন! নব-দম্পতির জন্যে খায়র ও বরকত এবং মঙ্গল ও কল্যাণের দু'আ করে দিলেন–

اللهم صب عليهما الخير صبا .. ولا تجعل عيشهما كدا كدا

'হে আল্লাহ! তুমি ওদের জীবনে কল্যাণের ধারা বইয়ে দাও! ওদের জীবনকে করো না কষ্টঘেরা!'

বিবাহের পর মাত্র কয়েকটা দিন কেটেছে। অমনি এলো জিহাদের ডাক। আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে বের হলেন জোলাইবিবও। যুদ্ধ শেষে যখন খোঁজ-খবর পড়লো, তখন অনেককেই পাওয়া গেলো না। আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন–

'কাউকে কি খুঁজে পাচ্ছো না?'

সাহাবায়ে কেরাম বললেন–

'অমুক অমুককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার বললেন–

'কাউকে কি খুঁজে পাচ্ছো না?'

সাহাবায়ে কেরামের কণ্ঠে ভেসে এলো একই উত্তর। কিন্তু নবীজীর পবিত্র যবানে ধ্বনিত হলো আবার একই জিজ্ঞাসা। সাহাবীদের জবাবও একই। নবীজী এবার সবাইকে বললেন–

'আমি যে জোলাইবিবকে দেখছি না!'

তখন সবাই আরো সচেতন হলেন এবং তাঁর খোঁজে বের হলেন। কিন্তু সারা যুদ্ধক্ষেত্র খোঁজাখুঁজি করেও তাঁরা হযরত জোলাইবিবের কোনো খোঁজ পেলেন না। অবশেষে তাঁকে পাওয়া গেলো নিকটবর্তী অন্য একটি জায়গায়– শহীদ অবস্থায়। পাশে পড়ে আছে সাত মুশরিকের লাশ। বোঝাই যাচ্ছে– তিনি বীর বিক্রমে লড়তে লড়তে এবং সাত সাতটি মুশরিককে জাহান্নামে পাঠিয়ে নিজেও পান করেছেন শাহাদতের 'লাল সুরা'! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন–

'ও সাতজনকে কতল করেছে অতঃপর শহীদ হয়েছে। ও সাতজনকে কতল করেছে অতঃপর শহীদ হয়েছে। ও আমার, আমিও ওর!'

এরপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই তাঁকে তুলে নিলেন এবং তাঁর জন্যে একটি কবর খননের নির্দেশ দিলেন।

হযরত আনাস রা. বলেন–

'আমরা কবর খনন করতে লাগলাম। আর জোলাইবিব শুয়েছিলেন খাটে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দুই হাতের খাটে। খনন শেষে তিনি নিজ হাতে জোলাইবিবকে কবরে শুইয়ে দিলেন।'

হযরত আনাস রা. আরো বলেন–

'আনসারদের ভিতরে জোলাইবিবের স্ত্রীর চেয়ে অধিক দানশীলা মহিলা আর ছিলেন না। জোলাইবিবের শাহাদতের পর অনেকেই তাঁর বিধবা পত্নীর কাছে বিবাহের পয়গাম নিয়ে ছুটে এলেন।'

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.

'যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা থেকে সাবধান থাকে, তারাই সফলকাম।'

كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى .

'আমার সমস্ত উম্মতই জান্নাতী, তবে যারা অস্বীকার করবে (তারা নয়)'। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন– 'কারা অস্বীকার করবে হে আল্লাহ্‌র রাসূল?' তিনি বললেন– 'যারা আমার আনুগত্য করবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যারা আমার অবাধ্যতা করবে, তারাই অস্বীকারকারী।'

পথ দু'টি– তোমার প্রিয় কোনটি?

কোথায় তুমি হে গুণবতী .. পুণ্যবতী– আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসা যার নেশা ও পেশা? তোমার মতো ক'জন পারে নফসের উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মহব্বতকে প্রাধান্য দিতে? যখনই তোমার সামনে এসেছে– আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্যের প্রশ্ন, তখন তুমি তাকে প্রাধান্য দিয়েছো সব কিছুর উপরে। তোমার বন্ধবীরা বলেছে–

'এই তুই এতো সেকেলে কেনো? আয় না আমাদের সাথে? বন্ধুদের সাথে ঘুরে বেড়াই, মজা করি, আড্ডা মারি।'

তুমি বলেছো–

'কাল্লা!' অসম্ভব! কক্‌খনো না!!

আবু দাউদ শরীফে আম্মাজান হযরত আয়েশা রা.-এর বরাতে বলা হয়েছে–

'কসম আল্লাহ্‌র! আল্লাহ্‌র কিতাবকে সত্য বলে মেনে নিতে এবং অবতীর্ণ অহীকে গভীরভাবে বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে আনসার নারীদের চেয়ে উত্তম নারী আর কাউকেই আমার চোখে পড়ে নি। আল্লাহ সূরা নূর-এ যখন

হিজাবের আয়াত অবতীর্ণ করলেন এবং তা শুনে পুরুষেরা যখন নারীদের কাছে পৌছে দিলেন, তখন স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রী শুনে, বাবার কাছ থেকে মেয়ে শুনে, ভাইয়ের কাছ থেকে বোন শুনে এবং আত্মীয়ের কাছ থেকে আত্মীয়রা শুনে সাথে সাথেই আমলের জন্যে সবাই ছুটোছুটি শুরু করে দিলো। কেউ ছুটে গেলো নিজের ওড়নার দিকে– মাথা ঢাকতে, কেউ বা নিজের ছায়ার দিকে– তা কেটে 'ওড়না' বানাতে! অর্থাৎ যার কাছে ছিলো না ওড়না ও অবগুণ্ঠন, তারও আর তর সইলো না, ছায়া বা দেহের নিম্নাংশের পরিধেয় বস্ত্র কেটে তা দিয়েই বানিয়ে নিলো সে ওড়না। এবং তৎক্ষণাৎ ঢেকে ফেললো নিজের মাথা ও চেহারা। কেনো এই তাড়াহুড়ো? আল্লাহর কিতাবের প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসের কারণে। তাঁর হুকুম পালনের জন্যে ব্যগ্রতা ও ব্যাকুলতার কারণে'

হযরত আয়েশা আরো বলেন–

'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এরপর মহিলারা সকলেই অবগুণ্ঠিত হয়ে গেলো। যেনো তাদের মাথায় কাক বসেছে!'

আল্লাহু আকবার! এই ছিলো সে যুগের মহিলাদের অবস্থা– যখন পর্দার ডাক এসেছে, তখন আমলের জন্যে তাঁরা প্রতিযোগিতা করেছেন। নিজেদের রূপ-লাবন্য আড়াল করার জন্যে এমনভাবে তারা অবগুণ্ঠিত হতেন যে, তাদের কোনো রূপ-অংশই পুরুষের দৃষ্টিতে প্রকাশ পেতো না।

হে একবিংশ শতাব্দির নারী!

তখন কেমন সব নারীকে হিজাবের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো? ভেবে দেখেছো কি? একজন উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা! আরেকজন নবী-নন্দিনী হযরত ফাতেমা! অপরজন আবু বকর তনয়া হযরত আসমা! এ ছাড়া আরো অন্যান্য পুণ্যবতী সাহাবিয়্যাহ!

আচ্ছা বলো তো, কার কাছ থেকে নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য আড়াল করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো তাঁদেরকে? কেমন পুরুষ ছিলেন তাঁরা? তাঁরা সবাই ছিলেন 'সোনার' মানুষ! ইনি হযরত আবু বকর! তিনি হযরত উমর! ইনি হযরত উসমান! তিনি হযরত আলী! এ ছাড়া অন্যান্য পুণ্যবান সাহাবায়ে কেরাম! সবাই এই উম্মতের পবিত্রতম ও পরিচ্ছন্নতম মানুষ।

সবচে' সৎ ও শুভ্র নৈতিকতার অধিকারী। এমন শিশির-শুভ্র চরিত্রের অধিকারী মানুষের সমাজেও আল্লাহ নারীদেরকে হিজাব গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন– সমাজের সততা ও শুভ্রতার পথের সকল কাঁটা ও বাধা দূর করার জন্যে। কঠোর ভাষায় নিষেধ করে দিয়েছেন হযরত আবু বকর, উমর, তালহা ও যোবায়েরসহ সকল সাহাবীকে– নারীর সঙ্গে উঠা-বসা করো না!

বলেছেন তিনি আল-কুরআনে–

> وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ
>
> 'তোমরা তাঁর (নবী) পত্নীদের কাছে (যারা সতীত্ব ও নৈতিক পরিচ্ছন্নতায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারী) কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। (কেনো এ বিধান? কেনো এ নিষেধাজ্ঞা?) এ বিধান তোমাদের এবং তাদের হৃদয়ের জন্যে অধিকতর পবিত্র।'

তাহলে এই নষ্ট যুগের নারী-পুরুষের জন্যে এই হিজাব-এর বিধান রক্ষা করা এবং তা মেনে চলা কতোটুকু জরুরী ও আবশ্যকীয়? কী বলবে তুমি ঐ সব দুঃসাহসিকা নারী সম্পর্কে? যারা হিজাব পরেই 'মার্কেটে' গিয়ে পুরুষ বিক্রেতার সাথে কথা বলছে– অবলীলায়? যেনো কথা বলছে নিজের স্বামীর সাথে কিংবা ভাইয়ের সাথে? মাঝে মধ্যে তো দেখা যায় এই আলাপে নারী– পুরুষ বিক্রেতাটির সঙ্গে কলকলিয়ে হেসে উঠে, কখনো কৌতুক করে– মূল্যহ্রাসের অভিলাষে কি?

কী বলবে তুমি ঐ নারী সম্পর্কে– যে একাকী চালকের সাথে বাইরে বেরিয়ে যায়? অথচ নারী-পুরুষ একাকী হলেই শয়তান এসে তাদের মাঝে অবস্থান নেয়!

এ-সব যে পাপ, এ ভালো করেই জানে এই 'আধুনিকারা'। কিন্তু এরপরও তারা পাপের পথে পা বাড়ায়। আল্লাহর নেয়ামতের না-শুকরি করে। আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামতের ছায়ায় বসবাস করেও ধৃষ্টতা দেখায়। এদের ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণে মনে হয়– আল্লাহ যেনো এদেরকে শাস্তি দিতে

'অক্ষম'। কিংবা আল্লাহ যেনো 'না-জেনে না-বোঝেই' ওদেরকে পর্দা করতে বলেছেন! নইলে কোনো কোনো বাচাল নারী বলে কোন্ সাহসে-

'একেবারে ভদ্রুকমার্কা পর্দা বর্তমানে সম্ভব না! পর্দার সাথে আধুনিকতার কিছুটা ছোঁয়া এবং 'ফ্যাশনের' কিছুটা পরশ থাকা চাই!'

এরা এতো ধৃষ্টতা কেমনে দেখায়?

আল্লাহ্‌র নেয়ামতের কথা একটু শুনবে? হাসপাতালে গিয়ে দেখো- সুস্থতা হারিয়ে ওখানে কতো মানুষ মরণ-যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। তোমার মতো কতো মেয়ে শুয়ে আছে হাসপাতালের সাদা বিছানায়। লড়ছে মৃত্যুর সাথে। অথচ কিইবা তাদের বয়স। তোমার চেয়ে বেশী হবে না। জীবনের একেবারে বসন্তকালে এখানে আসতে হয়েছে। একটু ভেবে বলো তো- হাসপাতালের ঐ রোগী তারা না হয়ে আমি-তুমিও তো হতে পারতাম!

আরো লক্ষ্য করো তাদের অবস্থা। কারো কারো নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। নিথর নিঃসাড় দেহটা পড়ে আছে বিছানায়। নড়ছে শুধু মাথাটা একটু একটু। চোখটাও 'কথা বলছে' কখনো কখনো। আর বাকি দেহে কোনো চেতনা নেই। হাত-পা কেটে ফেললেও সে বুঝতে পারবে না- কী ঘটে যাচ্ছে।

আল্লাহ্‌র সকাশে আমরা ওদের সুস্থতার জন্যে দু'আ করছি। দুনিয়ার এ কষ্টভোগের বিনিময় যেনো তিনি তাদেরকে দান করেন- পরকালে। আহ! কী করুণ অবস্থা তাদের! চোখে-মুখে বেঁচে থাকার আকুতি টপকে টপকে পড়ছে!

কারো কারো পেশাব-পায়খানা আটকে আছে। মনে-প্রাণে তারা চাচ্ছে- একটু পেশাব যদি বের হতো! কেনো পায়খানা হচ্ছে না? আর কি হবে না? পায়খানা না হওয়ার কারণে মৃত্যু- আহ! কী করুণ সে মৃত্যু!! এরচে' আরো করুণ হলো- কেউ কেউ বেহুঁশ পড়ে আছে বিছানায়। কখন যে পেশাব-পায়খানা বের হয়ে বিছানা-বালিশ ভরে যাচ্ছে, তারও কোনো খবর নেই! শিশুদের মতোই তাদেরক 'পেম্পাস' পরিয়ে রাখা হয়েছে। মাঝে-মধ্যে এই 'পেম্পাস' পরানো থাকে তিনদিন/ চারদিন। অপরিচ্ছন্ন অবস্থায়। খোলার কেউ থাকে না। এরা একদিন তোমার মতোই ছিলো। খেতো-হাসতো। আনন্দ-উল্লাসে উচ্ছল ঝরনার মতোই বয়ে যেতো তাদের

বেলা! 'মার্কেটে' যেতে মানা ছিলো না। সখীদের সাথে 'আড্ডা' দিতে বাধা ছিলো না।

হঠাৎ, হ্যাঁ হঠাৎ একদিন আলো হয়ে গেলো অন্ধকার।

রাঙা প্রভাত হয়ে গেলো কালো সন্ধ্যা।

সুখের চাদরে নেমে এলো দুঃখের বৃষ্টি।

কেউ জীবন হারালো গাড়ির নীচে চাপা পড়ে।

কেউ মারা গেলো উচ্চ রক্ত চাপে।

কেউ চলে গেলো হৃদযন্ত্র ক্রিয়া বন্ধ হয়ে।

জীবন্ত মানুষটা এখন মরা লাশ।

একদিন সে মানুষ ছিলো।

তার একটা নাম ছিলো।

আজ সে মরা লাশ!

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ. قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ.

'বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছো, আল্লাহ যদি তোমাদের শ্রবণ-শক্তি ও দৃষ্টি-শক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের হৃদয় মোহর করে দেন তাহলে আল্লাহ ব্যতিত কোন্ ইলাহ আছে, যে তোমাদের এগুলো ফিরিয়ে দেবে? দেখো, কীভাবে আমি আয়াত বিশদভাবে বর্ণনা করি, এরপরও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।'

শোনো! সব অসুস্থতাই অসুস্থতা নয়। কিছু কিছু অসুখ আল্লাহর শাস্তি ও প্রতিদান। কিন্তু আফসোস! অনেকেই তা বুঝতে পারে না। শিক্ষা নেয় না।

প্রতিযোগিতার ময়দানে!!

মু'মিন নারীরা ছোট-বড় সব পুণ্যকাজেই প্রতিযোগিতা করে। প্রতিটি ময়দানেই রয়েছে তাদের অবদান ও অংশ। জানো? কোন্ কাজ তোমাকে পৌঁছে দেবে জান্নাতের দোরগোড়ায়? এমনও তো হতে পারে যে, কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তুমি একটা ওয়াজ-নসীহতের ক্যাসেট দিয়ে এলে। অথবা কাউকে কোনো ভালোকাজের পরামর্শ দিলে। আর আল্লাহ্ এ কারণেই তোমায় ক্ষমা করে দেবেন! তোমার জন্যে জান্নাতের ফায়সালা করবেন! হতে পারে না?

জান্নাত যখন ডাকে এক গণিকাকে

বোখারী ও মুসলিম শরীফে এসেছে—

বনী ইসরাঈলের এক গণিকা মরুভূমিতে পথ চলছিলো। হঠাৎ তার চোখে পড়লো একটি কুকুর— একটা কূপের পাশে। কূপ থেকে পানি পানের জন্যে কুকুরটি একবার উপরে উঠছিলো আরেকবার নীচে নামছিলো। কূপটিকে কেন্দ্র করে ঘুরছিলো। সময়টা ছিলো প্রচণ্ড গরমের। তীব্র পিপাসায় কুকুরটি বারবার জিহ্বা বের করছিলো। গণিকাটি এ দৃশ্য দেখলো। থমকে দাঁড়ালো।

কতোবার সে আল্লাহ্‌র নাফরমানিতে লিপ্ত হয়েছে!

অন্যকে মন্দ কাজের জন্যে প্ররোচিত করেছে!

অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়েছে!

হারাম মাল ভক্ষণ করেছে!

আজ সে বিবেকের দংশন অনুভব করলো!

সে কূপের দিকে এগিয়ে গেলো!

নিজের পায়ের মোজাটি খুললো!

জুতো জোড়াও!

তারপর তা নিজের ওড়নার সাথে বেঁধে কূপ থেকে পানি উঠিয়ে কুকুরটির

পিপাসা নিবারণ করলো!

ফলে আল্লাহ তাকে মাফ করে দিলেন!!

আল্লাহু আকবার!

কেনো আল্লাহ তাকে মাফ করে দিলেন?

সে কি রাত জেগে জেগে ইবাদত করতো?

দিনের বেলা রোজা রাখতো?

সে কি আল্লাহর পথে জীবন বিলানোর শপথ নিয়েছিলো?

না! এসব কিছুই তার আমল নামায় লেখা ছিলো না!

সে শুধু এই কুকুরটিকেই পানি পান করিয়েছে!

এই তার আমলনামার যোগফল!

আর আল্লাহ শুধু এ জন্যেই তাকে ক্ষমা করে দিলেন!

খেজুর এবং জান্নাত

মুসলিম শরীফের হাদীস। একদিন উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা.-এর নিকট এক অসহায় মহিলা তার দুই মেয়েকে নিয়ে হাজির হলেন। এসে বললেন–

'হে উম্মুল মু'মিনীন! তিনদিন ধরে পেটে 'দানা-পানি' পড়ে নি! থাকলে কিছু দিন!'

হযরত আয়েশা ঘরময় খোঁজাখুঁজি করে মাত্র তিনটি খেজুর পেলেন। তাই এনে মহিলাটির হাতে দিলেন। মহিলাটি এতেই অনেক খুশি হলেন। দুই মেয়ের প্রত্যেককেই তিনি একটি করে খেজুর দিলেন। আর তৃতীয়টি নিজে খেতে নিলেন। মুখের কাছে হাতও তুললেন। কিন্তু খাওয়া আর হলো না! কেনো? তিনি দেখলেন– মেয়ে দু'টি তার খেজুরটির দিকে হাত বাড়িয়েছে! নিজেদেরটার কথা ভুলে গিয়ে! পেটে বেসামাল ক্ষুধা থাকলে যা হয়! মা তখন খেতে গিয়েও আর খেলেন না। তাকালেন মেয়েদ্বয়ের দিকে! তোলপাড় করে উঠলো মাতৃস্নেহ! তিনি দ্রুত নিজের খেজুরটি দু'ভাগ করে দুই মেয়ের হাতে তুলে দিলেন!

হযরত আয়েশা বলেন–

'তার মমতা আমাকে স্পর্শ করলো! আমি তা আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর নিকট বর্ণনা করলাম। সব শুনে তিনি বললেন–

إن الله قد أوجب لها بها الجنة .. أو أعتقها بها من النار .

'আল্লাহ এই খেজুরটির বিনিময়ে তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব করে দিয়েছেন! অথবা জাহান্নাম থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছেন!'

এক আরব কবি এ-হাদীসের আলোকে বড়ো সুন্দর করে শিশু-কিশোরদের জন্যে একটি কবিতা লিখেছেন। কথা ও বাণী– যেনো নবুওতের ঝরনাধারা থেকে প্রবাহিত। লক্ষ্য করো– আরবী ও বাংলা তরজমা!

امرأةٌ تحمل بنتين بيديها كالعصفورين

الجوعُ بدا في طلعتِها والهمُّ بدا في العينين

قد جاءتْ بيتَ رسول الله دقّت ، وانتظرت أن تلقاهْ

وهو الغائبُ من أين تراهْ وهي الجوعى من يومين

فتحت عائشةُ فرأتها والبنتان على كتفيها

ماتملكه قد أعطتْها تمرًا لايملأُ كفّين

يا امرأةٌ جائعةٌ حُرّةٌ تُطعِمُ بنتيها بمسرّةْ

لم يبقَ لها إلا تمرةْ شقّتْ تمرتَها نصفين

أطعمَت التمرةَ بنتيْها لم تأكلْ ، لم يبقَ لديْها

ومضتْ والبشرُ بعينيْها فرحت بهدوء البنتين

ورسولُ اللهِ وقد علما بالأمر ، تعجّبَ وابتسما

من قلبِ المـرأةِ ، كَمْ رحـما وسمـا من غـير جناحين

أكبرَ لمـا سمـع الخـبرَا أنْ الرحمنَ لهـا غفـرا

والجنةُ موعِـدُها ثمَـرا مِنْ رحمتِـها للبـنـتَـين

'চড়ুই পাখির মতো দু'টো ছোট্ট মেয়ে কোলে নিয়ে–

এলেন এক মহিলা।

ক্ষুধার ছাপ পরিস্ফুট তার অবয়বে।

দুঃশ্চিন্তা ঝরে ঝরে পড়ছে তার চোখ দিয়ে।

আল্লাহর রাসূলের গৃহে এসে তিনি কড়া নাড়লেন।

তাঁর সাথে সাক্ষাতের অভিলাষে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

কিন্তু তিনি তখন গৃহে ছিলেন না।

তাহলে কোত্থেকে তাঁর সাক্ষাত মিলবে?

এ দিকে দু'দিন ধরে তাঁর উপোস চলছে!

একটু পর হযরত আয়েশা এসে দরোজা খুললেন।

দেখলেন–

দু'টি মেয়েকে কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এক মহিলা।

যা ছিলো গৃহে তাই এনে দিলেন তিনি তাঁর হাতে।

খেজুর, হাত না-ভরা খেজুর!

হে ক্ষুধার্ত স্বাধীন মহিলা!

আনন্দচিত্তে খাইয়েছো না তুমি তোমার মেয়েকে–

খেজুর, সব খেজুর! নিজের ভাগেরটিও– দুভাগ করে?!

অবশিষ্ট খেজুরটিও তো খাইয়েছো তাদেরকে!

নিজে না খেয়ে, নিজে না রেখে!

তারপর চলে গেলো সে— নীড়ে!

খুশিতে ভাসতে ভাসতে!

তৃপ্ত যে এখন মা মণিরা!

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে জানলেন, সব জানলেন।

মুগ্ধ হলেন! মুচকি হাসলেন! এতো বড় মায়ের মন?

আহা! কী দয়া! কী আনন্দ!

যেনো ডানা ছাড়া আকাশের বুকে উড়ে বেড়ানো!

তিনি বললেন— সব জেনে,

'ওকে রহমান মাফ করে দিয়েছেন!

জান্নাতই তার ঠিকানা!

মেয়ের প্রতি অমন দরদী মা'র ঠিকানা তো জান্নাতই হয়!"[১]

জ্বলন্ত অঙ্গার ধারণকারী নারীরা ছুটে যায়-ই আল্লাহ্‌র আনুগত্যের দিকে। সে আনুগত্য যতো ছোট কাজেই হোক। সবচে' বড় কথা হলো— অন্যায়-অপরাধ ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকা। অন্যায়-অপরাধ ও পাপাচারকে ছোট করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। আল্লাহ্ বলেছেন—

وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ

'তোমরা ইহাকে তুচ্ছ মনে করেছো, অথচ আল্লাহ্‌র নিকট গুরুতর!'

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়েছেন যে, তিনি এক মহিলাকে জাহান্নামের আজাব ভোগ করতে দেখেছেন। প্রশ্ন হলো— কোন্ জিনিস তাকে জাহান্নামে নিয়ে গেলো? সে কি কোনো মূর্তির সামনে মাথা

নত করেছে? কোনো নবীর রক্তে নিজের হাত লাল করেছে? মানুষের অর্থ-সম্পদ আত্মসাত করেছে? না! এ-সব কিছু নয়! তাহলে কী কারণে সে জাহান্নামে গেলো? .. একটি বিড়ালকে কষ্ট দেয়ার কারণে! সে বিড়ালটিকে বন্দি করে রেখেছিলো। খাবারও দিতো না আবার ছেড়েও দিতো না। এক সময় না খেয়ে বিড়ালটি মারা যায়।

আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন- 'আমি মহিলাটিকে জাহান্নামে দেখেছি, বিড়ালটি তখন তাকে নোখ দ্বারা আঁচড়াচ্ছিলো।'

ইমাম বোখারী বর্ণনা করেছেন- আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হলো-

'হে আল্লাহ্র রাসূল! অমুক মহিলা রাত জেগে নফল ইবাদত করে আর দিনের বেলা রোজা রাখে। কাজ করে এবং প্রচুর দান-সদকা করে। কিন্তু প্রতিবেশীদেরকে কটুকথা বলে বলে সে অনেক কষ্ট দেয়।'

আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন-

'ওর মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। ও জাহান্নামী।'

সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন-

'আর অমুক মহিলা ফরজ নামাজ আদায় করে এবং যৎ সামান্য দান-সদকাও করে। কিন্তু সে কাউকে কষ্ট দেয় না।'

আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন-

'সে জান্নাতবাসিনী।'

যুদ্ধ!!

জানো?

তোমার বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, তার উদ্দেশ্য হলো তোমাকে 'ইচ্ছা বা হুকুমের দাসী'তে পরিণত করা- স্বাধীনতা ও সমান-অধিকারের নামে।

এই যে স্বাধীনতার কথা এরা বলে, এর অর্থ ও উদ্দেশ্য আসলে কী– জানো?

কেনো এরা নিপীড়িত শ্রমিকের অধিকার আদায়ের পক্ষে, বিপদগ্রস্ত মানুষের পক্ষে এবং অসহায় এতীমের পাশে দাঁড়ায় না– জানো?

কেনো শুধু অভিভাবকের স্নেহের ছায়ায় .. শাসনের ছায়ায় প্রতিপালিত সতী-সাধ্বী তরুণীদের প্রতি এদের এতো মায়া আর দরদ– জানো?

কেনো এরা সব সময় (শুধু) নারীর জন্যে স্বাধীনতা চায়– জানো?

ওদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই–

যৌনকাতর অশুভ পাপ-দৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার জন্যে হিজাব ও পর্দার জীবন কি দাসত্ব? যা থেকে মুক্ত হতেই হবে?

পর পুরুষের সংশ্রবমুক্ত আলাদা নারী কর্মস্থল নির্দ্ধারণ কি নারীর জন্যে লাঞ্ছনা ও অপমান? যা করা বা ভাবাই যাবে না?

গৃহে অবস্থান করে ছেলে-মেয়েকে লালন-প্রতিপালন করলে এবং স্নেহ-মায়া ও দূরদর্শী শাসন দিয়ে তাদেরকে আদর্শ মানুষ ও নাগরিক হিসাবে গড়ে তোললে– কোন্ যুক্তিতে একে তোমরা দাসত্ব বলবো? এ 'দাসত্ব' থেকে নারীকে মুক্ত না করলে– কী বিরাট ক্ষতিটা হয়ে যাবে?

মজার ব্যাপার হলো– যারা নারীকে 'দাসত্ব' থেকে মুক্ত করতে চীৎকার-চেঁচামেচি করছে এবং হিজাবকে নারীর জন্যে শেকল ও জেল ভাবছে, এদের অধিকাংশই হয় ব্যভিচারী নয় মদ্যপ কিংবা উন্মাতাল প্রবৃত্তির আত্মস্বীকৃত গোলাম। তাহলে এই এরাই কেনো নারীকে স্বাধীন করতে এতোটা উতলা? কেনো তারা সংরক্ষিত হেরেমে সতীত্বের বেষ্টনীতে বসবাসকারিণী নারীদেরকে বের করতে এতোটা মরিয়া? কেনো?!

উত্তর স্পষ্ট! এরা নারীকে চোখ ভরে দেখতে চায়! চোখের ক্ষুধা মেটাতে চায়! এরা নারীকে দেখতে চায়– স্বল্প বসনে নর্তকী হিসাবে! যখন নারীরা এদের ফাঁদে পড়ে হিজাব বর্জন করে এবং নাচের আসরে রূপ প্রদর্শন করে কিংবা এদের ইচ্ছেমতো কাজ করে, তখনই এদের কণ্ঠ উচ্চকিত হয়– 'এই দেখো! নারীকে মুক্ত করেছি আমরা!'

নারীকে এরা ভোগ করতে চায়– ইচ্ছেমতো। ফলে পুরুষের পাশে নারীর

অবস্থান এবং সংমিশ্রণকে শোভনীয় ও লোভনীয় করে তোলার জন্যে এদের চেষ্টা-সাধনা ও গবেষণার কোনো অন্ত নেই। এরা নারীকে বানিয়েছে 'চলন্ত হাম্মামখানা'। যখন ইচ্ছে তখনই নারীকে ব্যবহার করছে।

কখনো শয্যায়!

কখনো প্রমোদ-বাগানে!

কখনো বারে!

কখনো 'বিনোঁদন-পল্লীতে'!

কখনো বাণিজ্যিক প্রচারণায়!

কখনো বড়কর্তার অফিসে!

কখনো নাচের আসরে!

কখনো খেলার মাঠে!

কখনো ঐ নীলাভ আলো-জ্বলা 'বিশেষ পার্টি'তে–

আলো-ছায়ার আলিম্পনায়–

নারীকে আরো মোহনীয় করে তুলতে!

আরো বেশী আবেদনময়ী করে তুলতে!!

হায়রে আমার অবলা নারী!!

খেলার পুতুল হতে তোমার লজ্জা হয় না?

নাচের পুতুল হতে তোমার বিবেকে বাধে না?

ইসলাম তোমার জন্যে সংরক্ষণ করে রেখেছে মাতৃত্বের যে আসন, সম্মানের যে সিংহাসন, সে আসনে বসে, সে সিংহাসনে আসীন হয়ে রানী হতে তোমার সাধ জাগে না?

নারী! কেনো তুমি দাসী হতে চাও?

নারী! কেনো তুমি রানী হতে চাও না?

কেনো তুমি এই দুষ্টলোকদের পাল্লায় পড়ে ওদের কথায় হাসছো-গাইছো-নাচছো-খেলছো-ব্যবহৃত হচ্ছো?! ..

হাতে-গোনা কয়েকটি টাকার জন্যে?!

ছি! টাকা তো যেনতেনভাবেও কামাই করা যায়!

জানো না?

নইলে ঐ যে বাঈজি, তারও তো টাকা আছে!

ঐ টাকা কি সম্মানের?

হালাল-হারামের পার্থক্য তুলে দিয়ে কোথায় চলেছো তুমি?

না বলে পারছি না– ধিক, শত ধিক–

তোমার এ স্বাধীনতাকে!

তোমার এ স্বাধীনতা আসলে পরাধীনতা!

জানি না, কবে হবে তোমার সুমতি! হবে কি?

মনে রাখবে; তোমার পণ্যমূল্য একদিন কমে যাবেই ঐ দুষ্ট বণিকদের চোখে! তখন তোমাকে ওরা ছুঁড়ে ফেলে দেবে! নারীর যৌবন-জীবনের জৌলুসে ধ্বস নামলে ওরা নারীকে ক্ষমা করে না! ওরা বড়ো নিষ্ঠুর! নারীর 'পাক দামান'কে অপবিত্র ও ছিন্নভিন্ন করে ওরা চীৎকার করে বলে– এই দেখো! আমরা নারীকে দিয়েছি স্বাধীনতা!

خدعوها بقولهم حسناء   والغواني يغرّهن الثناء

'হায়! নারীকে এরা প্রতারিত করেছে মিষ্টি কথার মোড়কে! হে সুন্দরী নারী! প্রতারিত করলো তোমায় মিথ্যা শ্লাঘা?!'

এরা আরো চায় সমুদ্র তীরে নারীকে– বসনমুক্ত, উলঙ্গ দেখতে! মদের আসরে নারীর হাতে মদ খেতে! বিমান-সফরে নারীকে একান্ত কাছে পেতে– কখনো সেবিকার বেশে, কখনো পাপাচারিণী সঙ্গিনী হিসাবে! ফলে এ-সবকিছুকেই তারা নারীর সামনে শোভনীয় ও লোভনীয় করে তোলে। অবশেষে নারী যখন তাদের দেখানো পথে হাঁটতে হাঁটতে পাপাচারের

জলাভূমিতে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হয় এবং পাপাচারের জল পান করতে করতে নিঃশেষ করে নিয়ে এক সময় অবশিষ্টাংশ চাটতে থাকে, তখন এরা, এই এরা পরস্পরে হাসাহাসি করে আর বলে–

'আমরাই এনেছি হে নারী!

তোমার এই স্বাধীনতা!

তুমি না ছিলে বন্দিনী!

এখন হয়েছো নন্দিনী!

হে নন্দিনী! ভোগ করো!

জীবনটাকে উপভোগ করো!

ঐ মোল্লাদের কথায় কান দিও না!

ওরা কুরআন-হাদীসের দোহাই দিয়ে তোমাকে শুধু বঞ্চিত করতে চায়!

আশ্চর্য! আসলেই কি নারী ছিলো জেলাবদ্ধ?

আর এখন বেরিয়ে এসেছে মুক্ত স্বাধীনতায়?

স্বাধীনতা কি 'মামা বাড়ির আম কুড়ানো সুখ'?

কিংবা 'মাসির ঘরের মোয়া'?

কে বলেছে– স্বাধীনতা স্বল্প বসনে?

খাটো জামায়? পর্দাহীনতায়?

কে বলেছে– স্বাধীনতা বিপনী বিতানে ভিড় করায়?

পুরুষ-সঙ্গীর সঙ্গে লীন হয়ে যাওয়ায়?

স্বাধীনতা!

কে বলে তুমি পাপাচারী যুবকের সঙ্গে কথা বলা?

বিশ্বাসঘাতক পাপের বাজারে চুপি চুপি হাঁটা?

এমনই যদি হও তুমি, হে স্বাধীনতা!

তাহলে ধিক, শত ধিক তোমাকে!

আমি চাই না, আমার মাতৃজাতির জন্যে
এমন পাপময় কলুষিত স্বাধীনতা!!

প্রকৃত স্বাধীনতা তাহলে কী এবং কোথায়? প্রকৃত স্বাধীনতা হলো– এই ভণ্ডদের ডাকে সাড়া না দেওয়ায়। ঘৃণাভরে এদের প্রতারণাময় আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করায়। সতীত্ব রক্ষার জন্যে হিজাব ও পর্দার জীবনকে আঁকড়ে থাকায়।

মনে রাখবে হে নারী! এরা নয়– তোমার প্রকৃত বন্ধু– তোমার পিতা। তোমার ভাই। তোমার স্বামী। তোমার সন্তান। পিতা তোমাকে দেবেন স্নেহের ছায়া। স্বামী তোমাকে দেবেন মমতা ও ভালোবাসা। ভাই তোমাকে দেবে সতর্ক প্রহরা। সন্তান তোমাকে দেবে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

আচ্ছা বলো তো, এই যে এতো সব সম্মান, তা কোথায় পাবে তুমি– আল্লাহ্ পাকের বিধান ছাড়া? এখানেই তো আছে তোমার স্বাধীনতা এবং এ-ই তো তোমার স্বাধীনতা!!

তুমি নারী! তুমিই রানী! তুমিই দূত!!

সমাজ– দুই ভাগে বিভক্ত। ভিতরের এবং বাইরের। পুরুষ অধিপতি– বাইরের সমাজের। তার দায়িত্ব– কর্মের ময়দানে ঘাম ঝরানো শ্রম দিয়ে আয়-উপার্জন করা। খাদ্যের সংস্থান করা। গৃহ নির্মাণ করা। অসুস্থতায় সেবা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। ক্রয়-বিক্রয় করা। ইত্যাদি।

আর নারী গৃহের সাম্রাজ্যে অবস্থান নিয়ে গৃহ সাজাবে। সন্তানের শিক্ষা ও দীক্ষার দায়িত্ব নেবে। ঘরের যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দেবে। নারীর কাজ নারী করবে। পুরুষের কাজ পুরুষ করবে। একজনের কাজে আরেকজন ঢুকতে চাইলেই বিপত্তি দেখা দেবে।

বায়হাকীর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে– আসমা বিনতে ইয়াযিদ একবার আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এলেন। নবীজী তখন সাহাবায়ে কেরামের মাঝে বসা ছিলেন। তিনি এসে বললেন–

'আমার পিতা-মাতা আপনার জন্যে উৎসর্গীত হোক! আমি আপনার কাছে এসেছি মহিলাদের প্রতিনিধি ও দূত হয়ে! আপনার খিদমতে আমি আরজ করতে চাই- (আমার জান আপনার জন্যে কোরবান হোক) যতো নারী আছে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে, তারা আমার উচ্চারণ শুনুক বা না-শুনুক, আমি মনে করি তারা সবাই আমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলবে- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আপনাকে নারী-পুরুষ সবার কাছেই পাঠিয়েছেন সত্য ধর্ম- ইসলাম দিয়ে। আমরা সবাই আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। মহান রব-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি, যিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন। সত্যি কথা হলো: আমাদের নারী সম্প্রদায় অবরুদ্ধ, যেহেতু তারা অন্তঃপুরবাসিনী। তারা গৃহে বসে বসে আপনাদের গৃহের ভিত্তি নির্মাণ করে। আপনাদের চাহিদা পূরণ করে। তারা আপনাদের সন্তানের গর্ভধারিণী। আর আপনারা যারা পুরুষ সম্প্রদায়, তারা আমাদের চেয়ে এগিয়ে আছেন। আপনারা জুমা'য় অংশ নিতে পারেন। জামাতে শরীক হতে পারেন। রুগীদের দেখতে যেতে পারেন। জানাযায় শরীক হতে পারেন। হজ্জের পর হজ্জ করতে পারেন। সবচে' বড় কথা হলো আল্লাহ্র পথে জিহাদে বের হতে পারেন। আপনাদের কেউ যখন হজ্জে বা উমরায় যান অথবা জিহাদে যান, তখন আমরা আপনাদের মালের হিফাজত করি। আপনাদের কাপড় বুনন করি। আপনাদের সন্তানদের লালন-প্রতিপালন করি। হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি বিনিময় লাভে আপনাদের সাথে অংশীদার হবো?'

আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত সাহাবীদের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন-

'তোমরা কি কখনো এর আগে অন্য কোনো মহিলার উক্তি শুনেছো- দ্বীনের বিষয়ে এর জিজ্ঞাসার চেয়ে যা অধিক সুন্দর?'

সাহাবীরা বললেন-

'না!'

তখন আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দিকে তাকালেন এবং বললেন-

'হে নারী! ফিরে যাও! আর জানিয়ে দাও অন্য সকল নারীকে এ কথা- তোমাদের কেউ যদি স্বামীর হক আদায় করে, স্বামীর সন্তুষ্টি তালাশ করে

এবং তার মতামত মেনে চলে, তাহলে আল্লাহ পুরুষের সমস্ত আমলের নেকির বরাবর তাকে নেকি দান করবেন।'

এ কথা শুনে আসমা বিনতে ইয়াযিদ খুশিতে আনন্দে আপ্লুত হয়ে .. 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং 'আল্লাহু আকবার' বলতে বলতে ফিরে গেলেন।

হ্যাঁ, প্রত্যেকেরই রয়েছে আলাদা আলাদা জগত। আলাদা আলাদা ক্ষেত্র। নারীর সাম্রাজ্য হলো তার 'গৃহকোণ'। এই গৃহের সে-ই অধিপতি বা সম্রাজ্ঞী। আর তার স্বামী হলেন অধিকর্তা বা সম্রাট। আর সন্তানরা হলো সে সাম্রাজ্যের প্রজা।

উম্মে উমারাহ রা. -এর বীরত্ব

'তাবাকাত ইবনে সা'দ'-এর সূত্রে বলা হয়েছে যে, উম্মে উমারাহ রা. একজন নারী হওয়া সত্ত্বেও ওহুদ যুদ্ধে অংশ নেয়ার অনুমতি লাভ করেছিলেন। তাঁর কাজ ছিলো পানি পান করানো এবং আহতদের চিকিৎসা দান। কিন্তু যুদ্ধের এক পর্যায়ে যখন মুসলিম শিবিরে বিপর্যয় নেমে এলো এবং যে যেদিকে পারলো চলে গেলো। উম্মে উমারাহ রা. দেখলেন মুসলিম সৈন্যরা বিশৃঙ্খল। আর কাফেররা বীরত্ব প্রদর্শন করছে। হামলার পর হামলা করছে। প্রতিরোধ করে যাচ্ছেন শুধু আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পাশের দশজন সাহাবী। তখন উম্মে উমারাহ রা. আর স্থির থাকতে পারলেন না। পানি পান করানোর কাজ ফেলে ছুটে এলেন তিনি ঝলসানো তলোয়ার হাতে। অন্যান্য সাহাবীদের মতো তিনিও আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর কাছে এসে দুশমনের হামলা প্রতিহত করে যেতে লাগলেন। শুধু তাই নয়– তাঁর ঝলসে উঠা তলোয়ারে এক মুশরিক নিহতও হলো।

নারীরা গৃহেই থাকবে। তারা গৃহ-সম্রাজ্ঞী। কিন্তু মাঝে মধ্যে এ নিয়মের 'লঙ্ঘন'ও হয়। সেও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সন্তুষ্টি অর্জনের পথেই। ইসলাম বিরোধী কোনো কর্মকাণ্ডে নয়। স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে নয়। আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও কখনো কখনো জুতো সেলাই করেছেন। কাপড় পরিস্কার করেছেন। পরিবারের সহযোগিতা করেছেন।

জানো? তুমি আমাদের কাছে কতো মূল্যবান?

হ্যাঁ, তুমি আমাদের কাছে সীমাহীন মূল্যবান। আল্লাহ স্বয়ং নির্দেশ দিয়েছেন তোমার পিতা-মাতাকে– তাঁর রাসূলের মাধ্যমে। মুসলিম শরীফের হাদীস। আল্লাহ্‌র নবী বলেছেন–

من عال جاريتين حتى تبلغا. جاء يوم القيامة أنا وهو ضم أصابعه.

'যে ব্যক্তি দু'টি মেয়ে সন্তানের লালন-প্রতিপালন করবে পরিণত বয়সে পৌছা পর্যন্ত, সে জান্নাতে আমার এমন কাছাকাছি থাকবে, যেমন কাছাকাছি এই দু'টি আঙুল।'

আর তোমার সন্তানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমার সাথে সদাচরণ করতে। বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীস। এক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো–

'আমার উত্তম সাহচর্যের সবচে' বেশী হকদার কে?'

নবীজী বললেন– 'তোমার মা অতঃপর তোমার মা অতঃপর তোমার মা অতঃপর তোমার বাবা।'

বরং আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বামীকেও নির্দেশ দিয়েছেন স্ত্রীর প্রতি সদাচরণ করতে। যে নিজের স্ত্রীর সাথে রাগারাগি করে অথবা তার সাথে দুর্ব্যবহার করে, তাকে হাদীসের ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে।

বিদায় হজ্বের সময় আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। সামনে লক্ষাধিক সাহাবী। তাঁদের ভিতরে রয়েছেন সাদা ও কালো। ছোট ও বড়। ধনী ও গরীব। সবাইকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–

'সাবধান! তোমরা নারীদের মঙ্গল কামনা করবে! 'সাবধান! তোমরা নারীদের মঙ্গল কামনা করবে!'

আবু দাউদ শরীফে এসেছে– একদিন অনেক মহিলা এসে ঘুরে ঘুরে উম্মুল

মু'মিনীনদের নিকটে নিজেদের স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো। তা আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও জানতে পারলেন। তখন তিনি সাহাবীদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন–

'মুহাম্মদের পরিবারের নিকটে অনেক মহিলা এসে স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। (যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে) এরা তোমাদের মধ্যে ভালো লোক নয়।'

ইবনে মাজা ও তিরমিযী শরীফের হাদীস।

خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيركم لأهلي

'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে তার পরিবারের নিকট সর্বোত্তম। আমি আমার পরিবারের নিকট সর্বোত্তম।'

মেশক ও আম্বর।।

কখনো কখনো স্বামী সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়েও স্ত্রীর কাছে হিসাব গ্রহণ করেন। আর এটা করেন দ্বীনের স্বার্থে। পরকালে স্ত্রীর মুক্তির স্বার্থে।

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর দিকে তাকাও। মিসর থেকে একবার তাঁর নিকটে কিছু মেশক ও আম্বর এলো। তিনি তা বিক্রয় করে তার মূল্য 'বাইতুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার)-এ জমা করবেন। কিন্তু কাকে দেবেন বিক্রয়ের দায়িত্ব? কে পারবে মেশক ও আম্বরের মতো মূল্যবান ও সূক্ষ্ম জিনিস ভালো করে ওজন করতে? হযরত উমর রা. ঘোষণা করলেন–

'আমি চাই– ভালো করে মাপতে পারে এমন কোনো মহিলা এটিকে ভাঙুক এবং তা বিক্রি করে বাইতুল মালে টাকাটা জমা করুক। এ কথা শুনে তাঁর স্ত্রী বললেন–

'আমিই প্রস্তুত আছি হে আমিরুল মু'মিনীন!'

হযরত উমর রা. বললেন–

'তাহলে তুমিই করো।'

এরপর মহিলারা তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে মেশক ও আম্বর নিতে লাগলো। তিনি নিজ হাতে আম্বর ভেঙ্গে ভেঙ্গে তা বিক্রি করছিলেন। তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁর হাতের আঙুলে সামান্য সুগন্ধি লেগে যেতো, আর তিনি তা নিজের ওড়নায় মুছে নিতেন।

রাতে হযরত উমর ফিরে এলেন, এসে বিক্রিত মেশক ও আম্বরের টাকা স্ত্রীর কাছ থেকে বুঝে নিলেন। তাঁর স্ত্রী কাছে আসতেই তিনি একটা সুঘ্রাণ পেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন–

'তুমিও কি সুগন্ধি কিনেছো?'

স্ত্রী বললেন–

'না তো!'

তিনি তখন বললেন–

'তাহলে এ সুঘ্রাণ কোত্থেকে?'

স্ত্রী তখন জবাবে জানালেন–

'আমার আঙুলে যা লেগেছিলো, তা ওড়নায় মুছে নিয়েছিলাম।'

তখন হযরত উমর রা. বললেন–

'কী বলছো! মহিলারা নিজেদের পয়সায় ক্রয় করছে আর তুমি সুবাসিত হচ্ছো বিনা পয়সায়!!'

এরপর তিনি ওড়নাটি স্ত্রীর মাথা থেকে টেনে নিয়ে ছাদে চলে গেলেন। একটা পানিভরা মশকের কাছে। ধুইলেন খুব ভালো করে। বারবার শুঁকলেন। না, ঘ্রাণটা এখনো যায় নি। এরপর তিনি মাটিতে বিছালেন ওড়নাটি। পানি ঢেলে এবার মাটির সাথে ঘষতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত 'সুগন্ধি' দূর হলো! শেষে ভালো করে পানি ঢেলে পরিষ্কার করে ওড়নাটি তিনি স্ত্রীকে ফিরিয়ে দিলেন।

এ-সব তিনি কেনো করলেন? যাতে কঠিন হিসাব থেকে স্ত্রী বেঁচে যান। জাহান্নামের বেদনাদায়ক শাস্তি থেকে স্ত্রী রেহাই পান। আল্লাহর ঘোষণার উপর তিনি আমল না করলে কে করবেন?

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

'হে মু'মিনগণ! নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনকে বাঁচাও জাহান্নামের আগুন থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত রয়েছে নির্মম-হৃদয়, কঠোর-স্বভাব ফেরেশতাগণ, যারা অমান্য করে না আল্লাহ তাদেরকে যা আদেশ করেন তা এবং যা করতে তাদেরকে আদেশ করা হয়, তাই তারা করে।'

হে নারী! তোমার জন্যে পারি আমি গুঁড়িয়ে দিতে আমার মাথার খুলি!!

দ্বীন নারীকে এতো বেশী সম্মান দিয়েছে যে, একজন মাত্র নারীর জন্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। খুলি গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এসো উল্টাই ইতিহাসের পাতা—

ইহুদীরা বসবাস করতো মুসলমানদের পাশেই— মদীনায়। মদীনায় মুসলমানদের আগমনকে ইহুদীরা মোটেই ভালোভাবে নিতে পারে নি। ভিতরে ভিতরে খুব জ্বলতো ওরা। বিশেষ করে মহিলাদের হিজাব পরার নির্দেশ নিয়ে যখন ওহী নাজিল হলো, তখন ওরা তেলে-বেগুণে জ্বলে উঠলো। কোনো হিজাব-পরা মহিলাকে দেখলেই ওরা জ্বলতো। হিজাবের বিরুদ্ধে অনেক গোপন ষড়যন্ত্র করেও ওরা শেষ পর্যন্ত সফল হয় নি। অনেক নারীকেই বিপথগামী করার চেষ্টা করেছিলো ওরা। কিন্তু যে সকল নারীর হৃদয়ে ঈমানের নূর প্রবেশ করেছে— তারা কেনো বজ্জাত ইহুদীদের ফাঁদে পা দেবেন? সুতরাং ইহুদীরা ব্যর্থ হলো।

একদিন এক মুসলিম নারী বিশেষ প্রয়োজনে বনু কায়নুকার ইহুদীদের স্বর্ণ-বাজারে এলেন। তিনি ছিলেন হিজাব-ঢাকা। তিনি এক স্বর্ণকারের দোকানে এসে বসলেন। এদিকে ইহুদীরা তাঁকে হিজাব পরে দোকানে

বসতে দেখে তাঁর দিকে ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো। ইহুদীরা তাঁর চেহারা দেখে মজা লুটার জন্যে, পারলে তাঁকে স্পর্শ করার জন্যে অথবা তাঁকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার জন্যে ফন্দি-ফিকির আঁটতে লাগলো। নারীকে ইসলাম সম্মানিত করার পূর্বে নারীর সাথে এমন ব্যবহারই করতো ইহুদীরা।

ইহুদীরা তাঁকে চেহারা উন্মোচন করতে বললো। অবগুণ্ঠন খোলার জন্যে তাঁকে বিভিন্নভাবে প্ররোচিত করতে লাগলো। কিন্তু মুসলিম নারীটি ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করলেন। এদিকে ইহুদী স্বর্ণকারটি এক অসতর্ক মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে মহিলার পরনের কাপড়টির নীচের একটি অংশ তাঁর পীঠের ওড়নার সাথে বেঁধে ফেললো। একটু পর মহিলাটি যখন দাঁড়াতে গেলেন তখন পেছন দিক থেকে তাঁর সতর অনাবৃত হয়ে গেলো! উপস্থিত ইহুদীরা তখন এক যুগে হেসে উঠলো। মজা লুটতে লাগলো। এ আকস্মিক দুর্ঘটনায় মহিলাটি চীৎকার করে উঠলো। বলতে লাগলো–

'হায়! ওরা যদি আমার সতর অনাবৃত না করে আমাকে মেরে ফেলতো!'

এ-ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এক মুসলিম যুবক তাঁর তলোয়ার খাপমুক্ত করলেন। ঝাঁপিয়ে পড়লেন খবিস স্বর্ণকারের উপর। এবং নিমিষেই তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন। তখন সমবেত ইহুদীরাও তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এবং তাঁকেও হত্যা করলো।

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পারলেন ইহুদীদের চুক্তি ভাঙার কথা। নারীর প্রতি অপমান ও লাঞ্ছনা ছুঁড়ে দেয়ার কথা। তিনি ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। বনু কায়নুকার ইহুদীদেরকে অবরোধ করার নির্দেশ দিলেন। অবরোধ আরোপিত হলো। অবরোধে বেশ কাজও হলো। কয়েকদিনেই ইহুদীরা কাবু হয়ে আত্মসমর্পণ করলো।

এরপর এলো সেই মুসলিম নারীকে অসম্মানিত করার সাজা দেয়ার পালা। আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার ইচ্ছে করলেন। এর মধ্যেই বাধ সাধলো মুসলিম বেশী এক জলজ্যান্ত শয়তান। যার কাছে মুসলিম নারীর সম্ভ্রমের কানাকড়ি মূল্যও নেই। বরং নারীকে যে মনে করে শুধু 'ভোগ্যপণ্য'। এই শয়তানটার নাম আবদুল্লাহ

ইবনে উবাই। মুনাফিকদের মাথা। সরদার। সে বললো–

'মুহাম্মদ! আমার ইহুদী বন্ধুদের প্রতি সদাচরণ করুন!'

জাহেলী যুগে ইহুদীরা তার মিত্র ছিলো। কিন্তু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথায় কর্ণপাত করলেন না। যারা মু'মিনদের ভিতরে অশ্লীলতা ছড়াতে চায়, তাদেরকে করে ক্ষমা করা যায় না! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কঠোর মনোভাব দেখে 'মুনাফিক-নেতা' আবার তাঁর কাছে সুপারিশ করলো। বললো–

'মুহাম্মদ! আমার বন্ধুদের প্রতি সদাচরণ করুন!'

আগের মতোই নবীজী তার সুপারিশকে আমলে নিলেন না। বরং নারীর সম্ভ্রম ও 'গায়রত'কে রক্ষা করার স্বার্থে তিনি নিজের সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। এতে শয়তানটা বেশ চটে গেলো। সে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বর্মের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বললো–

'আমার মিত্রদের প্রতি সদয় হতে হবে! আমার মিত্রদের প্রতি সদয় হতে হবে!'

আল্লাহর রাসূল তার আচরণে বেশ অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন–

'ছাড়ো আমাকে!'

কিন্তু মুনাফিকটা তাঁকে ছাড়লো না। নবীজীকে বারবার অনুরোধ করতে লাগলো। ইহুদীদেরকে কতল না করার আবেদন করতে লাগলো। অগত্যা নবীজী তার দিকে তাকিয়ে বললেন–

'ঠিক আছে, তোমার কথাই থাকলো।'

কিন্তু তিনি ইহুদীদেরকে প্রাণে না মারলেও নির্বাসিত করলেন।

খাটিয়ার উপরেও!!

নবী নন্দিনী হযরত ফাতেমা ছিলেন সব সময় হিজাব ও পর্দাপ্রিয় মেয়ে। এমনকি মৃত্যুর পর কীভাবে তাঁর পর্দা রক্ষা হবে– এ নিয়েও তাঁর দুশ্চিন্তার কোনো অন্ত ছিলো না। যখন তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো, তখন তিনি বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন এই ভেবে যে, মৃত্যুর পর তো পুরুষরা তাঁকে

দেখবে কাপড় দিয়ে মোড়ানো। তখন তাঁর আকার-আকৃতি তো তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে! এ-সব ভাবতে ভাবতেই তিনি পাশে বসা হযরত আসমা বিনতে আবু বকরকে বললেন–

'আসমা! মৃত্যুর পর মহিলাদেরকে যেভাবে দাফন-কাফন করা হয়, আমার কাছে তা ভীষণ অপছন্দ!'

হযরত আসমা বললেন–

'হে নবী নন্দিনী! আমি আপনাকে একটি জিনিস দেখাতে পারি, যা আমি হাবশায় দেখে এসেছি।'

হযরত ফাতেমা বললেন–

'কী দেখে এসেছো?'

তখন হযরত আসমা একটি খেজুর গাছের তাজা ডাল আনালেন এবং তা বাঁকা করলেন। তখন তা দেখতে একেবারে গম্বুজের মতো খিলানময় হয়ে গেলো। তারপর তিনি তার উপর একটি কাপড় ঢেলে দিলেন। তখন হযরত ফাতেমা খুশি হয়ে বললেন–

'দারুণ! খুব সুন্দর! এতে পুরুষ থেকে নারীকে আলাদা করে চেনা যাবে।'

তাঁর ওফাতের পর হযরত আসমার দেখানো পন্থায়ই তাঁকে কাফন-দাফন করা হয়!

এই হলো মৃত্যুর বিছানায় শুয়েও হযরত ফাতেমার হিজাব ও পর্দা-চিন্তা। এখন বলো তো, জীবদ্দশায় হিজাব ও পর্দার প্রতি তিনি কতোটা সচেতন ও গুরুত্ব প্রদানকারী ছিলেন?

সুবহানাল্লাহ! কোথায় সেই মুসলিম নারীরা, যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসে বলে দাবি করে! হৃদয়-মন যাদের বিভোর হয়ে আছে জান্নাত-স্বপ্নে– এ দাবিও করে! কিন্তু প্রশ্ন হলো– তবুও কেনো তারা যায়– 'মহিলা সেলুনে'? কেনো সেখানে গিয়ে তারা আরেক মহিলার সামনে সতর খুলে দেয়– সতরের অংশ থেকে চুল ফেলে দেয়ার জন্যে! অথচ তিরমিযী শরীফে এসেছে যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

ما من امرأة تضع ثيابها .. في غير بيت زوجها .. إلا هتكت الستر بينها وبين ربها.

'যে নারী স্বামীর ঘর ব্যতিত অন্য কোথাও সতর খুলবে, আল্লাহ এবং তার মধ্যকার পর্দা সে ছিন্ন করে ফেললো।'

বায়হাকী'র বর্ণনা-

شر نسائكم المتبرجات المتخيلات ، وهن المنافقات ، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم .

'তোমাদের মধ্যে সবচে' নিকৃষ্ট নারী হলো বে-পর্দা ও অহংকারী নারীরা। এরাই মুনাফিক। এদের জান্নাতে প্রবেশ বড়ই দুরূহ ব্যাপার।'

বরং কোথায় সেই নারীরা, যাদের ব্যাপারে আমরা এই আশায় বুক বেঁধেছিলাম যে, এরা ইসলামকে সহযোগিতা করবে? ইসলামের জন্যে নিজেদের জান-মাল খরচ করবে? হঠাৎ দেখা গেলো- তারা কেউ গায়ে চড়িয়েছে নকসিকৃত বোরকা অথবা পরেছে 'হাই হিল' তারপর গিয়েছে 'মার্কেটে' অথবা বিনোদন-'পার্কে'! কিংবা পরেছে 'প্যান্ট' বা 'ট্রাউজার' আর বলছে- 'আমার ভাইয়েরা ছাড়া এ অবস্থায় আমাকে আর কেউ দেখে না! অথবা আমি শুধু মহিলাদের মধ্যেই এ-সব পরি!'

সত্যি কথা হলো এসবের কিছুই জায়েয নেই। যেমনটা বলেছেন উলামায়ে কেরাম।

কখনো কখনো দেখা যায় নারী নিজে তো অপরাধে লিপ্ত হয়েছেই, তার উপর সে আরেকজনকেও অপরাধে লিপ্ত হতে প্ররোচিত করছে। নিজেদের মধ্যে অশ্লীল ছবি বিনিময় করছে। সন্দেহজনক ফোন নম্বর বিনিময় করছে। কিংবা নষ্টামি আর নচ্ছারিতে ভরা পত্র-পত্রিকা বিনিময় করছে। আল্লাহ বলেছেন-

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

'যারা মু'মিনদের ভিতরে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্যে রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।'

হায় বেচারি!!

নারী যদি খোলামেলা ও পর্দাহীন অবস্থায় চলাফেরা করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে, তবে এ তার জন্যে এক অশনি সঙ্কেত। কেননা তা নারীকে ধীরে ধীরে নষ্ট জীবনের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। মানুষের চোখেও সে মূল্যহীন ও তুচ্ছ হয়ে পড়বে।

আমি একবার কয়েকজন 'ছাত্রের' কাছে জানতে চেয়েছিলাম, যারা বিপণি বিতানগুলোতে কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল ফটকে (ছুটির সময়) নারীদের পেছনে পেছনে ঘুরঘুর করে–

'তোমরা সে সব তরুণীকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখো– যারা তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়?'

তারা সবাই তখন আমাকে জানালো–

'বিশ্বাস করুন! আমরা মোটেই তাদেরকে ভালো চোখে দেখি না। আমরা তাদেরকে 'নষ্ট-প্রকৃতির' মনে করি। তাকে নিয়ে এবং তার বুদ্ধিকে নিয়ে আমরা একটু 'প্রেম-প্রেম খেলা' করি। তারপর আমাদের ইচ্ছে পূরণ হয়ে গেলে কিংবা প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে ওদেরকে 'পদদলিত করি!'

বরং তাদের মধ্য থেকে একজন আমাকে এও জানালো যে, 'শায়খ! বিশ্বাস করুন, যখন আমরা বিপণিকেন্দ্রগুলোতে ঘুরে বেড়াই আর কোনো লজ্জাবতী সুশীলা পর্দানশীন নারীকে দেখতে পাই, তখন তাকে নিজের অজান্তেই শ্রদ্ধা জানাই। তার নিকটবর্তী হওয়ার সাহসই পাই না। বরং কেউ এমন সাহস করলে আমরাই তাকে বাধা দিই।'

তুমি একটু লক্ষ্য করো সেই সব দেশের প্রতি যেখানে 'স্বাধীনতা' রয়েছে বলে মানুষ ধারণা করে। সেখানে নারীরা এতোটাই খোলামেলা ও আবরণহীন বরং এতোটাই চারিত্রিক ধ্বংস ও নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার যে, তা শুনে রীতিমতো তুমি আঁতকে উঠবে এবং অনুশোচনার আগুনে জ্বলতে থাকবে। সংক্ষিপ্ত একটা পরিসংখ্যান পেশ করছি–

আমেরিকাতে প্রতিদিন এক লক্ষ নয় শ' যুবতী বলাৎকারের শিকার হয়। এর মধ্যে একশ'তে বিশজন বলাৎকারের শিকার হয় নিজেদের জন্মদাতার পক্ষ থেকে।

সেখানে বছরে দশ লক্ষ শিশুকে হত্যা করা হয়– গর্ভপাতের মাধ্যমে অথবা জন্মের সাথে সাথে। আমেরিকাতে একশ'র ভিতরে ষাটটি তালাকই স্ত্রীর পক্ষ থেকে।

বৃটেনে প্রতি সপ্তাহে একশ সত্তর জন যুবতী জারজ সন্তান প্রসব করে। তবে সেখানে অনেক যুবতী এমনও পাবে– যারা তোমার মতো পর্দা ও হিজাবের জীবনকে কামনা করে।

নারীরা যতো খোলামেলা হবে অশ্লীলতার বাজার ততো গরম হবে। বেড়ে যাবে চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই এবং বিভিন্ন রকমের অপরাধ। শয়তান পৃথিবীতে অশান্তি ও অরাজকতা সৃষ্টির জন্যে এই নারীকেই ব্যবহার করে। সুতরাং যে নারী শয়তানের ফাঁদে পা দেবে, শয়তানের আনুগত্য করবে, প্রবৃত্তির দাসত্বকে মেনে নেবে, 'আধুনিকতা' ও 'ফ্যাশন'-এর আনুগত্য করবে– পোষাকে কিংবা বোরকায়, ভ্রূ-কর্তনে বা তা সরু করায়, গান-বাজনায় বা ছায়াছবি ও নাটক দেখায়, অথবা পত্র-পত্রিকায় এবং এ-সব তার নিকটে তার রব-এর শরীয়ত পালনের চেয়েও বেশী মূল্যবান হয়ে উঠবে, তাহলে সেই নারীই নাফরমান। রব-এর অবাধ্যাচারিণী। তার জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে জাহান্নামের আগুন।

মুসলিম শরীফের হাদীস। হযরত আবু হোরায়রা রা. বলেন–

'আমরা একদিন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকটে বসা ছিলাম। তখন আমরা একটি বিকট শব্দ শুনতে পেলাম। আল্লাহর নবী আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন–

'জানো ইহা কী?'

আমরা বললাম–

'আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ভালো জানেন।'

তিনি বললেন–

'ইহা একটি পাথর। জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছে সত্তর শরৎকাল ধরে, এখন তা গিয়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে জাহান্নামের তলদেশে।'

আল্লাহ্ বলেন–

> خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً لا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلا نَصِيراً. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ.
>
> 'সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং তারা কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। যেদিন তাদের মুখমণ্ডল অগ্নিতে উলট-পালট করা হবে সেদিন তারা বলবে– 'হায়! আমরা যদি আল্লাহকে মানতাম এবং রাসূলকে মানতাম!'

এই হলো সেই নারীর অবস্থা, যে তার রব- এর নাফরমানি করবে এবং নিজের আখেরাতকে ভুলে যাবে। তার মিজান বা আমলের পাল্লা হালকা হবে। তার ব্যাপারে পিতা-মাতা কোনো দায়-দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করবে এবং নিজেদেরকে মুক্ত ঘোষণা করবে। কোনো উপকারে আসবে না তাদের সখী ও বান্ধবীরা। কোনো কাজে লাগবে না তাদের বালা ও চুড়ি এবং ম্যাগাজিন ও পত্রিকা।

জাহান্নামীরা কেমন থাকবে জাহান্নামে? তারা আগুনে জ্বলতে থাকবে অনন্ত কাল। আসবে না ঘুম। হবে না মরণ। হাঁটতে হলে হাঁটতে হবে আগুনেই। বসতে গেলে বসতে হবে আগুনেই। পান করতে হবে জাহান্নামবাসিদের দূষিত রস। খেতে হবে জাক্কুম। বিছানা? সেও আগুন। লেপ-তোষক? সেও আগুন। পরনের কাপড়-চোপড়? সেও আগুন। শুধু আগুন আর আগুন। আগুন ছেয়ে থাকবে তাদের চেহারায়। জাহান্নামীরা থাকবে শেকলপরা। শেকলের মাথা থাকবে ফেরেশতাদের হাতে। যখন তখন

তারা এদেরকে জাহান্নামের আগুনে টেনে-হেঁচড়ে ঘুরে বেড়াবে। তখন কী ভয়ানক কষ্ট যে হবে! তাদের শরীর থেকে দূষিত রস বা পূঁজ বা ঘাম বের হবে। শোনা যাবে আর্ত চীৎকার। খোস-পাঁচড়ায় তাদের দেহ থেকে চামড়া খসে খসে পড়বে। থাকবে শুধু হাড্ডি। তাদের দেহ থেকে ছড়াবে তীব্র কটু গন্ধ। কেমন সে গন্ধ? যদি কোনো জাহান্নামীকে দুনিয়ায় আসার সুযোগ দেয়া হয়, তাহলে তার শরীর থেকে ছড়ানো কটু গন্ধে দুনিয়ার সব মানুষ মারা যাবে এবং তাদের আকৃতি বিকৃত হয়ে যাবে।

বনী ইস্রাঈলের বৃদ্ধার গল্প

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এক বেদুঈন এলো। নবীজী তাকে সম্মান করলেন। বললেন–

'এসো!'

কাছে এলে নবীজী বললেন–

'চাও, তোমার কী প্রয়োজন।'

লোকটি তখন বললো–

'সওয়ার হওয়ার জন্যে একটি উট চাই আর আমার পরিবারের দুধ পানের জন্যে কয়েকটি বকরী চাই।'

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন–

'তোমরা কি বনী ইসরাঈলের বৃদ্ধার মতো হতেও অক্ষম?'

সাহাবায়ে কেরাম বললেন–

'হে আল্লাহর রাসূল! বনী ইসরাঈলের বৃদ্ধা, সে আবার কী (ঘটনা)?'

নবীজী তখন কাহিনী বলা শুরু করলেন। মূসা আ. যখন মিশর থেকে রওয়ানা হলেন, তখন পথে পথ হারিয়ে ফেললেন। তখন তিনি বলে উঠলেন–

'এ কী? পথ হারিয়ে ফেললাম যে!'

'ইউসুফ আলাইহিস সালাম মৃত্যুর সময় আমাদের কাছ থেকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, মিশর থেকে চলে গেলে আমরা যেনো সাথে করে তাঁর 'হাড্ডি' (অর্থাৎ মৃত্যুর পর তাঁর দেহাবশেষ) নিয়ে যাই।'

তখন মূসা (আ.) বললেন–

'আমরা কোথায় খুঁজে পাবো তাঁর কবর?'

'তা বলে দিতে পারবে বনী ইসরাঈলের এক বৃদ্ধা।'

তখন বৃদ্ধার কাছে লোক পাঠানো হলো। বৃদ্ধা উপস্থিত হলে মূসা আ. বললেন–

'আমাদেরকে ইউসুফ আ.-এর কবর দেখাও!'

মহিলাটি তখন বললো–

'দেখাতে পারি, তবে শর্ত আছে।'

'কী শর্ত?'

'আমাকে একটি প্রতিশ্রুতি দিতে হবে!'

'প্রতিশ্রুতি? কিসের প্রতিশ্রুতি?'

'আমার জান্নাত হবে আপনার সাথে– এ প্রতিশ্রুতি!'

মূসা আ. তাকে এমন প্রতিশ্রুতি দিতে চাইলেন না। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে ওহী পাঠিয়ে নির্দেশ দিলেন–

'তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে দাও!'

অগত্যা মূসা আ. প্রতিশ্রুতি দিলেন। তখন মহিলাটি আনন্দচিত্তে তাদেরকে নিয়ে একটি জলাশয়ের কাছে পৌছলো। বললো–

'এখান থেকে পানি সরাও।'

পানি সরানো হলো। তখন বৃদ্ধা বললো–

'এবার খনন করো'

কথামতো খননকাজ চালানো হলো। অবশেষে বেরিয়ে এলো ইউসুফ আ.-এর হাড্ডি। হাড্ডি বের করে আনতেই রাস্তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেলো।'

দেখলে তুমি? কী বিশাল পার্থক্য দু'টি চাওয়ার মাঝে? দুধ পানের জন্যে বকরী আর সওয়ার হওয়ার জন্যে উট চাওয়া এবং জান্নাতে নবীর সঙ্গে থাকতে চাওয়ার মাঝের এই যে পার্থক্য, তা কি আসলেই বিশাল নয়?।

এ আসলে কিছুই নয়– শুধু আকাশ-ছোঁয়া হিম্মত! নারী যদি চায় জান্নাতে যেতে এবং নবীর সঙ্গে থাকতে– তাহলে এর জন্যে শুধু প্রয়োজন– আকাশ-ছোঁয়া হিম্মত!

সুতরাং ঠিক করে বলো তো!

অন্য কারো দিকে না তাকিয়ে বলো!

আমি শুধু তোমার কাছেই জানতে চাই!

বলো! কী তোমার আশা-আকাঙ্ক্ষা?

কী তোমার স্বপ্ন-অভিলাষ?

কী আছে তোমার চাওয়া-পাওয়ার?

কোথায় তুমি যেতে চাও?

কোন্ দিগন্তকে তুমি স্পর্শ করতে চাও?

তুমি কি 'বড় চিন্তা'র বাহক হতে চাও?

এসো তাহলে 'বড় চিন্তা'র সাথে পরিচয় করিয়ে দিই!

'বড় চিন্তা' কী?

'বড় চিন্তা' হলো– তুমি শুধু নিজেকে নিয়ে বাঁচবে না, ভাববে না। বাঁচবে দ্বীনকে নিয়ে। ভাববে দ্বীনকে নিয়ে। তোমার ভাবনা হবে না– মোজা ও তার জুতা। তোমার ভাবনা হবে না– কেশ ও তার বিন্যাস। পার্থিব সুখ-শান্তির আকাশে ডানা মেলে উড়ে বেড়ানো কিংবা কালের স্রোতের সাথে গা ভাসানো– এও তোমার কাজ নয়। তোমার কাজ হলো– শুধু দ্বীনের খেদমত। যেমন তুমি যদি দেখতে পাও তোমার কোনো বোন আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত, তাহলে তাকে উপদেশ দাও। ফিরে আসতে বলো। নারীদেরকে তুমি আলোর পথে তুলে আনতে নিজেকে উজাড় করে দাও।

ইসলাহী বা দাওয়াতী মজলিস কায়েম করে সেখানে নিজের সবটুকু জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও শ্রম-সাধনা ঢেলে দাও। তাদের মাঝে বিলিয়ে দাও ভালো ভালো ক্যাসেট। যাকে যেভাবে কাছে টানা দরকার, তাকে সেভাবেই কাছে টানো। তোমার জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় আলোকিত করো তাদের মন-মানসকে।

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

'কথায় ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কে উত্তম, যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে এবং বলে 'আমি তো আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত'।

এই যদি হয় তোমার 'মিশন', তাহলে আমি হলফ করে বলতে পারি- যেখানেই থাকো তুমি হে নারী, হে রানী! তুমি বরকতময়! তুমি সৌভাগ্যবতী!

আমরা তোমাকে মনে করি- পুণ্যবতী! যারা পরপুরুষের দিকে তাকায় না। দৃষ্টি নিম্নগামী করে রাখে। এমনকি যে সকল নারীর দিকে তাকালে কখনো কখনো প্রলুব্ধ হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাদের দিকেও তাকায় না। মনে রাখবে; যারা হারাম দৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকায় অবহেলা করে, নির্জন নারী সংস্রবকে কিছু মনে করে না, তাদেরকেই যিনা ও ব্যভিচারের ঝুঁকির মধ্যে পড়তে হয়। কিংবা নারী-সমকামিতায় আক্রান্ত হতে হয়! আল্লাহ আমাদেরকে হিফাজত করুন!

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً.

'অবৈধ যৌন-সংযোগের নিকটবর্তী হয়ো না। ইহা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।'

বোখারী শরীফে এসেছে-

নবীজী একদল নারী-পুরুষকে উনানের মতো সংকীর্ণ একটি স্থানে দেখতে পেলেন। যার নীচের অংশ প্রশস্ত এবং উপরের অংশ সংকীর্ণ। তারা সেখানে আর্ত-চীৎকার করছিলো। হঠাৎ হঠাৎ তাদের নীচ থেকে দাউ দাউ আগুন বেরিয়ে আসছিলো। সে আগুনের গরমে তাদের আর্ত-চীৎকার

আরো বেড়ে যাচ্ছিলো।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

'তখন আমি বললাম– ভাই জিবরীল! এরা কারা?'

তিনি বললেন–

'এরা ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী! এ-ই এদের শাস্তি। এ শাস্তি কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।'

আখেরাতের শাস্তি বড়ো কঠিন শাস্তি। আল্লাহর কাছে পানাহ চাই! যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে দুনিয়াতে কোনো কিছু তরক করে, আল্লাহ পরকালে তার বিনিময় দান করেন।

একটি কাহিনী শোনো!

আল্লামা দিমাশকী 'مطالع البدور' (পূর্ণিমার চাঁদের উদয়স্থল) কিতাবে উল্লেখ করেছেন– তৎকালীন কায়রোর আমির সুজাউদ্দীনের কথা। তিনি বলেন–

'আমি মালভূমিতে এক লোকের কাছে বসা ছিলাম। তখন তার বয়স বেশ হয়ে গেছে। গায়ের রঙ তামাটে বর্ণের। ঠিক সেই মুহূর্তে কয়েকটি ছেলে সেখানে এসে উপস্থিত হলো। সুন্দর ফকফকে সাদা– ওদের গায়ের রঙ। আমি তার কাছে জানতে চাইলাম–

'এরা এমন 'দুধ-চেহারা' পেলো কেমন করে?'

তখন জবাবে তিনি জানালেন–

'ওদের মা আসলে ইংরেজ। তার সাথে আমার জীবন এক ঘাটে এসে মিশে যাওয়ার একটা (প্রেম) কাহিনী আছে।'

আমি কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। গল্পটা জানতে চাইলাম। তিনি শুরু করলেন তাঁর গল্প বলা– এভাবে:

'আমি সিরিয়া গিয়েছিলাম একেবারে টগবগে যৌবনে। তখন সিরিয়ায় চলছিলো ফিরিঙ্গিদের দখলদারিত্ব। সেখানে গিয়ে আমি ভাড়ায় একটা দোকান খুলে বসলাম। আমার ব্যবসা ছিলো কাতান বস্ত্রের।

একদিন আমি দোকানে বসে আছি। এমন সময় ভিতরে প্রবেশ করলেন এক ইংরেজ মহিলা। তিনি ছিলেন এক নেতৃস্থানীয় ক্রুসেডার-পত্নী। আমি তার রূপ-লাবন্য দেখে বিমোহিত হয়ে গেলাম। তাই তার কাছে যা বিক্রি করলাম, অনেক কমদামে বিক্রি করলাম। তিনি চলে গেলেন। কয়েক দিন পর আবার এলেন। আবারও আমি তাকে ভীষণ খাতির করলাম। এরপর থেকে তিনি আমার দোকানে নিয়মিতই যাতায়াত করতে লাগলেন। আমি দিলখুলে তাকে গ্রহণ করতাম। অন্যদের তুলনায় অনেক কমদামে তার কাছে পণ্য বিক্রি করতাম। এভাবে সামনে চলতে চলতে আবিস্কার করলাম যে, আমি তাকে ভালোবেসে ফেলেছি। আমার এ ভালোবাসায় যখন প্লাবন সৃষ্টি হলো, নিয়ন্ত্রণের বাঁধ তখন ভেসে গেলো। আমি আর নীরব থাকতে পারলাম না। অনুভব করলাম– আমার ভিতরে যেনো একটা বৃক্ষ জন্ম নিয়েছে। কচি কচি সবুজ পাতায় তা ছেয়ে গেছে। সেখানে ফোট-ফোট কলিরা চোখ মেলার অপেক্ষা করছে। আমাকে নিয়ে আমার ভিতরে কিসের যেনো একটা আয়োজন চলছে। এ-ই কি ভালোবাসার পেলব অনুভূতি? বুক ধুকধুক-করানো কাতরতা?

যাই হোক, 'মেম' সাহেবার সঙ্গে আসতো এক বৃদ্ধ। একদির তার কানেই বলে ফেললাম কথাটা–

'আমি 'মেম' সাহেবাকে ভালোবেসে ফেলেছি! সামনে বাড়তে চাই! তুমি পথ বলে দাও! দেবে?!'

তখন বুড়িটি চোখ উল্টে আমার দিকে তাকালো আর বললো–

'ইনি তো এক সেনাপতির বিবি! তিনি সব জানতে পারলে শুধু তোমাকে নয়– আমাদেরকেও আস্ত রাখবেন না!!'

কিন্তু আমি হাল ছাড়লাম না। বুড়িকে সহযোগিতা করার জন্যে রাজি করাতে আপ্রাণ চেষ্টা ব্যয় করে যেতে লাগলাম। এক সময় বুড়ি ফোকলা মুখে হাসলো। আমার কাছে পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা দাবি করলো। কথা দিলো– বিনিময়ে সে 'মেম' সাহেবাকে নিয়ে আমার গৃহে হাজির হবে। আমি অনেক কষ্টে বিশটি স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করলাম এবং বুড়িটির হাতে গুজে দিলাম।

প্রথম রাত্রি

যে রাত্রিতে তার 'আগমন' হওয়ার কথা আমার গৃহে, সে রাত্রি শুরু হতেই আমি অধীর ও অস্থির অপেক্ষায় প্রহর গুনতে লাগলাম। অবশেষে আমার অপেক্ষার পালা শেষ হলো। অধীরতা ও অস্থিরতাও কমলো। 'মেম' সাহেবা এলেন। কুশল বিনিময়ের পর আমরা একসঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া করলাম।

রাত্রি বেশ কিছুটা অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর আমার মনে বিবেকের দোল অনুভব করলাম। বিবেক যেনো আমায় বলছে–

'তুমি কি আল্লাহকে ভয় পাও না? এক পরনারীর সামনে এমন নির্লজ্জভাবে বসে থাকতে তোমার কি একটু বাধছেও না? আল্লাহর সামনে বসে আল্লাহর নাফরমানি করছো? এক খৃষ্টান নারীর প্রেমে পড়ে?'

বিবেকের চোখ-রাঙানিতে আমার 'প্রেম-তরীটা' বায়ূহীন হয়ে পড়লো। 'মেম' সাহেবের ঘাটে ভিড়ানো আর সম্ভব হলো না। আকাশের দিকে তাকালাম। তখন চোখটা একটু একটু ভিজা। মনটা একটু একটু নরম। মনে হলো– আল্লাহ যেনো আকাশ থেকে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। আমি আকাশের দিকে চোখ তুলে বললাম– 'মালিক আমার! আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি– এই খৃষ্টান নারীর সাথে আমি কোনো অসংলগ্ন আচরণ করবো না। কেননা আমি তোমাকে লজ্জা পাই! আমি তোমার শাস্তি কে ভয় করি!'

এরপর আমি তার কাছ থেকে দূরে সরে গেলাম। অন্য কামরায় চলে গেলাম।

'মেম' আমার এ আচরণ ও ভাবান্তর দেখে বিস্মিত হলেন। আমার দিকে ক্ষুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হনহন করে বেরিয়ে গেলেন!

সকালে যথারীতি আমি দোকানে গেলাম। বেলা কিছুটা গড়িয়ে যেতেই দেখলাম– 'মেম' আমার সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছেন। চেহারায় প্রচণ্ড ক্ষোভ ও অসন্তুষ। ওর রূপের কথা না বলে পারছি না! যেনো চাঁদ! ওকে দেখে নতুন করে আবার আমি ভালোবাসা-প্লাবিত হলাম। ভালোবাসার সেই বৃক্ষটা আবার আমার হৃদয়ে ডালাপালা বিস্তার করলো। ছায়া দিয়ে আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। আমি আবার কাবু হয়ে গেলাম! মনকে

বললাম বরং শয়তান আমাকে দিয়ে বলালো–

'কে তুমি? এতো সাধু হয়ে গেলে যে! এ চন্দ্রমুখীর চন্দ্র-সৌন্দর্য এড়িয়ে যাওয়ার মানে কি? তুমি কি খলীফা আবু বকর? উমর? নাকি বনে গেছো মহা সাধক জুনাইদ বাগদাদী? কিংবা মহা তাপস হাসান বসরী?!'

তার জন্যে আমার মনটা ভীষণ তোলপাড় করতে লাগলো। ও যখন আমাকে অতিক্রম করে চলে গেলো, আমি ছুটে গিয়ে সেই বুড়িকে ধরলাম। আবার অনুরোধ করলাম–

'রাত্রিতে আবার একটু নিয়ে এসো তাকে– আমার কাছে, আমার বাড়িতে!'

সে ঠোঁট উল্টে বললো–

'তাকে আবার পেতে হলে একশ' দীনার গুনতে হবে!'

আমি বললাম–

'গুনতে হলে গুনবো, তবুও তাকে আনবো!'

আমি আবার দীনার সংগ্রহে লেগে গেলাম এবং সফল হলাম। তাকে দিয়েও দিলাম।

দ্বিতীয় রাত্রি

এলো রাত্রি। দ্বিতীয় রাত্রি। চললো অপেক্ষা। তার আগমনে ভাঙলোও অপেক্ষা। তাকিয়ে দেখলাম– সত্যিই যেনো আমার বাড়িতে চাঁদ নেমে এসেছে! চাঁদের বুকে তো আছে একটা কালিমা, ওর চেহারায় শুধু আছে রূপ-ঝরানো লালিমা! কিন্তু তার পাশে এসে বসতেই আল্লাহ্‌র ভয় এসে আবার আমার ঘুমন্ত বিবেককে জাগিয়ে দিলো। বিবেক চোখ লাল করে আমার দিকে তাকালো। বললো–

'ছি! এমন দুঃসাহস কী করে হলো তোমার? এক খৃষ্টান কাফের ললনার জন্যে বিলিয়ে দেবে নিজের দ্বীন-ঈমান?!'

আমি ভয় পেয়ে গেলাম। আগের মতো তাকে রেখে অন্য কামরায় 'পালিয়ে' গেলাম!

সকালে দোকানে গেলাম। হৃদয় জুড়ে বিরাজ করছিলো শুধু 'মেম'-চিন্তা। বেলা গড়াতেই তার দেখা পেলাম। আমার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছেন আগের মতোই ক্ষুব্ধ ভঙ্গিতে। তাকে দেখা মাত্রই সেদিনের মতো আজো প্রবৃত্তির কাছে পরাজিত হলাম। তাকে রাত্রিতে পেয়েও হারানোর বেদনায় আক্ষেপ করতে লাগলাম। নিজেকে তিরস্কার করতে লাগলাম। আক্ষেপে আক্ষেপে কেটে গেলো কিছু বেলা। বেশীক্ষণ সইতে পারলাম না জেগে উঠা প্রেমের দহন-জ্বালা। শরণাপন্ন হলাম আবার বুড়ির। কিন্তু বুড়িটি এবার ভীষণ চটা। বললো–

'তাকে উপভোগ করতে পারবে না পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রার থলে ছাড়া!'

পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রার থলে!! আমি যে একেবারে ফতুর হয়ে যাবো! তবুও বললাম–

'তাই হবে। তাই দেবো! তবুও তুমি আয়োজন করো!'

আমি দোকানটা বিক্রি করে দিয়ে পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রা তার জন্যে আলাদা করে রাখলাম!

ঠিক তখনই আমার কানে একটা ঘোষণা এলো। এক খৃষ্টান ঘোষক বলছিলো–

'হে মুসলিম সম্প্রদায়! তোমাদের সাথে আমাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ। এখানকার মুসলিম ব্যবসায়ীদেরকে আমরা এক সপ্তাহের ভিতরে চলে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করছি।'

ঝড়ের উপর ঝড়!

প্রেমের ঝড়েই যখন হলাম প্রায় ফতুর,

এখন কেনো তবে এ নতুন ঝড়?

ঝড়ের ভিতরে বেড়ে উঠা মানুষ আমি।

তাই ঝড়কে 'স্বাগত' জানালাম।

নিজের করণীয় ঠিক করে ফেললাম।

নিজেকে প্রবোধ দিলাম।

যদিও সিরিয়াকে 'বিদায়' বলতে হলো– অনেক কষ্টে!

হৃদয়ে তখন বইছিলো বিরহের প্রচণ্ড ঝড়!

জানি না, এ ঝড় থামবে কবে!

জানি না, এর শেষ কোথায়!

দেশে ফিরে আমি বাঁদীর ব্যবসা শুরু করলাম। এর ভিতর দিয়ে 'মেম'কে ভুলে থাকার চেষ্টা করলাম। এভাবে কেটে গেলো তিনটি বছর। তারপর সংঘটিত হলো হিত্তিন যুদ্ধ।[1] মুসলমানরা ফিরে পেলো উপকূলীয় শহরগুলো। বিজয়ী বাদশাহ্র জন্যে বাঁদী তলব করা হলো– আমার কাছে। একশত দীনারের বিনিময়ে আমি এক অপরূপা বাঁদীকে তাঁর হাতে তুলে দিলাম। আমাকে নব্বই দীনার পরিশোধ করা হলো। দশ দীনার বাকী রাখা হলো। বাদশাহ্ আমাকে দেখিয়ে বললেন–

'একে নিয়ে চলো আমাদের সাথে। যেখানে আমরা খৃষ্টান মহিলাদেরকে বন্দি করে রেখেছি, সেখানে। ও ইচ্ছেমত সেখান থেকে একটি খৃষ্টান বাঁদী বেছে নিতে পারবে– বাকী দশ দীনারের পরিবর্তে।'

পুরস্কার ও বিনিময়!!

আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো সেই গৃহে। ঢুকতেই দেখলাম– হায়! এ যে আমার হারানো 'মেম'!! তিনি বন্দিনী। তিনি আমাকে চিনলেন না। কিন্তু আমি তাকে চিনলাম। আমি দশ দীনারের বিনিময়ে তাকেই বেছে নিলাম। তার পূর্ণ মালিক হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম–

'আমাকে চেনেন?'

'না।'

---

১. ইসলামের বীর সেনাপতি, ক্রুসেডারদের চির আতঙ্ক গাজী সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর নেতৃত্বে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। এ যুদ্ধেই ক্রুসেডারদের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে। এর কিছুদিন পরই হযরত আইয়ুবীর হাতে ইসলামের প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাস মুক্ত হয়। ক্রুসেডাররা পরাজয়ের গ্লানি ও মুসলিম বীরদের করুণা নিয়ে নিজেদের দেশে ফিরে যায়। এখন সেই আর নেই। এখন আল-আকসা অবরুদ্ধ। বেদখল। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো কি আমরা? নেই যে এখন কোনো আইয়ুবী।

'আমি আপনার সেই কাতান ব্যবসায়ী! যার কাছ থেকে আপনি দুইবারে দেড়শ' দীনার নিয়েছিলেন। তৃতীয়বার বলেছিলেন, আমাকে পেতে হলে পাঁচশত দীনার দিতে হবে! এই যে, আজ আমি মাত্র দশ দীনারে আপনার মালিক হয়ে গেলাম!!'

আমার কথা যখন শেষ হলো, তখন দেখলাম, তার দৃষ্টি ঝাপসা। ঠোঁট কাঁপা কাঁপা। একটু পরই বুঝলাম- কেনো এই ছলছলানি! তিনি উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন- আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ!'

হ্যাঁ, আমার 'মেম' মুসলমান হয়ে গেলেন। মনে-প্রাণে। এরপরই আমাদের মাঝে শাদী হয়ে গেলো!

কিছুদিন যেতেই তার মা একটি ছোট্ট বাক্স পাঠালেন। তাতে দু'টি থলে পাওয়া গেলো। একটিতে পঞ্চাশ দীনার আর অপরটিতে একশত দীনার। কুদরতের কারিশমায় আমি মনে মনে হাসলাম। বুঝলাম, সব হয়েছে তাঁরই ইশারায়। সবই ফেরত পেয়েছি তাঁর কারিশমায়। মজার ব্যাপার হলো- যে জামাটি পরে সে আমার মন লুটে নিয়েছিলো, সেই জামাটিও ছিলো এই ছোট্ট বাক্সে।

হ্যাঁ ভাই! তোমাকে আমি অনেক লম্বা কাহিনী শুনিয়ে ফেললাম। এই যে দেখতে পাচ্ছো আমার আশপাশে এই ছেলেদেরকে, এরা সবাই 'মেম' সাহেবার সন্তান!

আসলে বান্দা যদি আল্লাহর জন্যে কোনো কিছু তরক করে, তাহলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে বদলা দেন। বিনিময় দান করেন। আল্লাহর ভয়ে আমি 'মেম' সাহেবাকে গভীর ভালোবেসেও কলুষিত হই নি, তাই আল্লাহ আমাকে বদলা দিয়েছেন। বান্দা অনায়াসে নিজেকে আড়াল করে রাখতে পারে আরেকজন বান্দার কাছ থেকে। কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে কেউ নিজেকে আড়াল করে রাখতে পারে না। লুকিয়ে রাখতে পারে না। সে যখন যেখানেই যাক এবং যে অবস্থাতেই থাকুক, তা আল্লাহর কাছে একটুও অবিদিত থাকে না!'

সলিল সমাধির মহিমা।

সতী-সাধ্বী নারীর সম্ভ্রম খোয়ানো যায় না। তার সম্মান নষ্ট করা যায় না। সতীত্ব ও সম্ভ্রম রক্ষার প্রশ্নে প্রয়োজনে সে জীবন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

খাত্তাবী তার বিখ্যাত গ্রন্থ– عدالة السماء (আকাশের ইনসাফ)-এ উল্লেখ করেছেন:

চল্লিশ বছর পূর্বে বাগদাদে এক কশাই ছিলো। ফজরের আগেই সে দোকানে চলে যেতো। ছাগল জবাই করতো। এরপর রাত থাকতে থাকতেই সে ফিরে আসতো বাড়িতে। সূর্যোদয়ের পর দোকান খুলে বসতো– গোশত বিক্রির জন্যে।

একদিন সে ছাগল জবাই করে বাড়ি ফিরছিলো। তখনো রাতের আঁধার কাটে নি। আজ অনেক রক্ত লেগেছে তার জামা কাপড়ে। পথিমধ্যে সে এক গলির ভিতর থেকে একটা কাতর গোঙানি শুনতে পেলো। দ্রুত এগিয়ে গেলো সে গোঙানিটা লক্ষ্য করে। হঠাৎ সে একটা দেহের সাথে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলো। একটা যখমী লোক পড়ে আছে মাটিতে। যখম গুরুতর। বাঁচাতে হলে দ্রুত চিকিৎসার প্রয়োজন। এখনো দরদর করে রক্ত বেরুচ্ছে। ছুরিকাঘাত। ছুরিটা এখনো দেহে গেঁথে আছে। দ্রুত সে ছুরিটা ঝটকা-টানে বের করে ফেললো। তারপর লোকটিকে কাঁধে তুলে নিলো। কিন্তু লোকটি পথেই এবং তার কাঁধেই মারা গেলো।

এরপরের ঘটনা হলো– লোকজন জড়ো হলো। কশাইয়ের হাতে ছুরি। সদ্য মৃত লোকটির গায়ে তাজা রক্ত। এ সব দেখে লোকজনের স্থির ধারণা হলো যে, সে-ই ঘাতক। অগত্যা তাকে হন্তারক হিসাবে অভিযুক্ত হতে হলো এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হলো। যখন তাকে 'কিসাস'-এর জায়গায় আনা হলো এবং মৃত্যু যখন প্রায় অবধারিত, তখন সে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বলে উঠলো–

'হে উপস্থিত জনতা! আমি এই লোকটিকে মোটেই হত্যা করি নি। তবে আজ থেকে বিশ বছর আগে আমি অপর একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছিলাম। আজ যদি আমার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়, তাহলে এর পরিবর্তে মোটেই নয়, বরং ওর পরিবর্তে।'

অতঃপর সে বিশ বছর আগের হত্যার ঘটনাটি বলা শুরু করলো এভাবে—

'আজ থেকে বিশ বছর আগে আমি ছিলাম এক টগবগে যুবক। নৌকা চালাতাম। লোকজনকে পারাপার করতাম। একদিন এক ধনবতী যুবতী তার মাকে নিয়ে আমার নৌকায় পার হলো। পরদিন আবার তাদেরকে পার করলাম। এভাবে প্রতিদিনই আমি তাদেরকে আমার নৌকায় পার করতাম। এ পারাপারের সুবাদে যুবতীটির সাথে আমার আন্তরিকতা ও ভালোবাসা গড়ে উঠলো। ধীরে ধীরে আমরা একে অপরকে গভীরভাবে ভালোবেসে ফেললাম। এক সময় আমি তার পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে গেলাম। কিন্তু আমার মতো দরিদ্র এক মাঝির কাছে মেয়ে দিতে তিনি অস্বীকার করলেন।

এরপর আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। সেও এদিকে আর আসতো না। তার মাও আসতো না। সম্ভবত মেয়েটির বাবা নিষেধ করে দিয়েছিলো। আমি অনেক চেষ্টা করেও তাকে ভুলতে পারলাম না। এভাবে কেটে গেলো দুই থেকে তিন বছর। একদিন আমি নৌকা নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম আরোহীর। এমন সময় এক মহিলা ছোট্ট একটি মেয়েকে নিয়ে ঘাটে উপস্থিত হলো এবং আমাকে নদী পার করে দিতে অনুরোধ করলো। আমি তাকে নিয়ে রওয়ানা দিলাম। মাঝ নদীতে এসে তাকালাম তার চেহারার দিকে। চিনতে দেরী হলো না। আমার সেই 'প্রেয়সী'। এর পিতা আমাদের মাঝে বিচ্ছেদের পর্দা টেনে না দিলে এ আজ আমার স্ত্রী থাকতো। আমি তাকে দেখে খুশি হলাম। বিভিন্ন মধুময় স্মৃতির ডালি একে একে তার সামনে মেলে ধরতে লাগলাম। সে প্রতি উত্তর করছিলো খুব সতর্কতার সাথে এবং বিনয়ের সাথে। একটু পর সে জানালো— সে বিবাহিতা এবং সঙ্গের শিশুটি তারই সন্তান।

আমার মন বড়ো অস্থির হয়ে গেলো। আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম না। একটা অশুভ ইচ্ছা আমাকে তাড়া করলো। আমি তাড়িতও হলাম। এক পর্যায়ে যৌন-পিপাসা নিবৃত্ত করার জন্যে আমি তার উপর চাপাচাপি শুরু করলাম। সে আমাকে মিনতি করে বললো—

'আল্লাহকে ভয় করো! আমার সর্বনাশ করো না!'

আমি মানলাম না। আমি ফিরলাম না। তখন অসহায় নারীটি শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে আমাকে প্রতিরোধের চেষ্টা করতে লাগলো। তার শিশু কন্যাটি চীৎকার করতে লাগলো।

আমি তখন তার শিশু কন্যাটিকে শক্ত হাতে ধরে বললাম–

'তুমি আমার আহ্বানে সাড়া না দিলে তোমার সন্তানকে আমি পানিতে ডুবিয়ে মারবো!'

তখন সে ডুকরে কেঁদে উঠলো। হাত জোড় করে মিনতি জানাতে লাগলো! কিন্তু আমি এমনই অমানুষে পরিণত হলাম যে, নারীর অশ্রু ও কান্না কিছুই আমার কাছে আমার প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার চেয়ে 'মূল্যবান' মনে হলো না। আমি নিষ্ঠুরভাবে শিশুকন্যাটির মাথা পানিতে চেপে ধরলাম। মরার উপক্রম হতেই আবার বের করে আনলাম। বললাম–

'জলদি রাজি হও! নইলে একটু পরই এর লাশ দেখবে!'

কিন্তু যুগপৎ সন্তানের মায়ায় এবং সতীত্বের ভালোবাসায় অশ্রু ও বিলাপের অস্ত্র বারবার সে ব্যবহার করতে লাগলো, যা আমার কাছে ছিলো অর্থহীন, মূল্যহীন। আমি আবার চেপে ধরলাম মাথাটাকে পানিতে। শিশুটি হাত-পা নাড়ছিলো। জীবনের বেলাভূমিতে আরো অনে-ক দিন হাঁটার স্বপ্নে দ্রুত হাত-পা ছুঁড়ছিলো। কিন্তু ওর জানা ছিলো না– কেমন হিংস্রের হাতে পড়েছে ও। এবার আমি আর তার মাথাটা তুলে আনলাম না। ফল যা হবার তাই হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই শিশুটি নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেলো! আমি এবার তাকালাম তার দিকে। কিন্তু মেয়ের করুণ মৃত্যুও তাকে নরম করতে পারলো না। সে তার সিদ্ধান্তে অনড়, অবিচল। ওর দৃষ্টি যেনো বলছিলো–

'সন্তান গিয়েছে, প্রয়োজনে আমিও যাবো! জা-- দেবো! তবু মান দেবো না!!'

কিন্তু আমার মানুষ-সত্তা হারিয়ে গিয়েছিলো। বিবেক-সত্তা ঘুমিয়েছিলো– গভীর সুপ্তির কোলে। আমার মাঝে রাজত্ব করছিলো শুধু আমার পশু-সত্তা। আমি নেকড়ের মতো তার দিকে এগিয়ে গেলাম। চুলকে মুষ্টিবদ্ধ করলাম। তারপর তাকেও পানিতে চেপে ধরলাম। বললাম– 'ভেবে দেখো জলদি! জীবনের মায়া যদি করো তবে আবার ভাবো!'

সে ঘৃণাভরে 'না' বলে দিলো। আমিও তাকে চেপে ধরে রাখলাম। এক সময় আমার হাত ক্লান্ত হয়ে এলো। সাথে সাথে ওর দেহটাও নিথর হয়ে গেলো! আমি ওকে পানিতে ফেলে দিয়ে ফিরে এলাম!

আমার অপরাধের খবর আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানলো না। মহান সেই সত্ত্বা, যিনি বান্দাকে সুযোগ দেন কিন্তু ছুঁড়ে ফেলে দেন না।'

এই করুণ কাহিনী শুনে উপস্থিত সবার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো। এরপর তার শিরোচ্ছেদ করা হলো।

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ

'তুমি কখনো ভাববে না যে, জালিমরা যা করে, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল।'

দেখলে, সতীত্ব ও সম্ভ্রম রক্ষায় সতী-সাধ্বী নারীরা কতো আপোষহীন? নিজের মেয়েটা নিজের চোখের সামনে জীবন দিলো। তবুও সে আপোষ করলো না। নিজের জীবন বিলিয়ে দিলো। তবুও নিজের মান সে বিলিয়ে দিলো না! তার সতীত্ব ও সম্ভ্রমের গায়ে একটা কাঁটাও ফুটতে দিলো না।

এমনই হয় বোন, সতী নারীরা এমনই হয়! কিন্তু তুমি কি পেলে– এ কাহিনী থেকে কোনো শিক্ষা ও চেতনা?

ধন্য তুমি হে ফেরিওয়ালা!

ইবনুল জাওযী তার مواعظ নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন:

এক দরিদ্র যুবক রাস্তায় ফেরি করে করে জিনিসপত্তর বিক্রি করতো। একদিন সে এক বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় এক মহিলা উঁকি দিলো। কী আছে তার কাছে– জানতে চাইলো। সে জানালো কী কী আছে তার ছোট্ট খাজানায়। মহিলাটি তাকে ভিতরে গিয়ে জিনিস দেখাতে বললো। সে ভিতরে ঢুকতেই মহিলাটি দরোজা আটকে দিলো। তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার কু-প্রস্তাব দিলো। ফেরিওয়ালাটি পরিস্থিতির আকস্মিকতায় একেবারে থ হয়ে গেলো। কিন্তু হাল ছাড়লো না। বললো–

'অসম্ভব! আমি তেমন লোক নই!'

মহিলাটিও চোখ লাল করে বললো–

'তুমি রাজি না হলে আমি চীৎকার দেবো! লোক জড়ো করে বলবো, তুমি আমার উপর চড়াও হয়েছো! তখন মৃত্যু ছাড়া তোমার আর কোনো পথ থাকবে না!'

লোকটি বললো–

'আল্লাহকে ভয় করো!'

কিন্তু মহিলাটি আল্লাহকে ভয় করলো না! তার দাবী থেকে সরে এলো না। লোকটি পেরেশান হয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগলো। একটু পর বললো–

'আমাকে একটু শৌচাগারে যেতে দেবে?!'

এবার মহিলাটি না বলতে পারলো না। লোকটি শৌচাগারে ঢুকেই নীচের ট্যাংকি থেকে পায়খানা নিয়ে নিয়ে দেহে ও কাপড়-চোপড়ে 'মেখে' বের হয়ে এলো! এ কদাকার অবস্থা দেখেই ঘৃণায় মহিলার সারা দেহ রি রি করে উঠলো। সে চীৎকার করে উঠলো এবং তাকে ঘর থেকে বের করে দিলো।

লোকটি তখন তার পসরা ফেলেই দৌড়ে বেরিয়ে গেলো। পথে শিশুরা তাকে এমন অবস্থায় এমন করে দৌড়াতে দেখে হল্লা করে বলতে লাগলো–

'ঐ দেখ্, একটা পাগল যায়!'

'পাগল' বাড়িতে এসে সবকিছু ধুয়ে-মুছে 'ভালো' হয়ে গেলো। কিন্তু এ কী! তার সারা শরীর জুড়ে যে মেশক-আম্বরের সুঘ্রাণ!!

ইতিহাস বলে; সব সময় লোকটির গা থেকে এই সুগন্ধি বের হতো।

হায়! কোথায় হারিয়ে গেলো আমাদের সোনালী সেই দিনগুলো! এখন তো এক নারী এক 'টেলিফোন সংলাপেই' বিকিয়ে দেয় নিজের সতীত্ব ও সম্ভ্রম!

হায় মোর অভাগা জাতি!!

দুনিয়ার মিথ্যা স্বাদে কেনো হারাচ্ছো তুমি–

আখেরাতের সুখ-প্রাসাদ?

এতো অবলা তুমি?

এতো অদূরদর্শী তুমি?

এতো অসাবধান তুমি?

এতো বোকা তুমি!

বোকা হয়েও নিজেকে ভাবো এতো চালাক তুমি?

পাপের গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসতে ভাসতেও নিজেকে সংস্কৃতিবান ও শিক্ষিত ভাবো তুমি?

কবে হবে তোমার সুমতি?!

তাওবার অশ্রুতে হাসে যখন নারী।

ইবনে কুদামাহ তার التوابون নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন:

একদল দুষ্টলোক এক সুন্দরী মহিলাকে রবী ইবনে খায়সাম -এর পেছনে লেলিয়ে দিলো। বলে দিলো–

'যদি তুমি রবী ইবনে খায়সামকে তোমার রূপ-যাদুতে মুগ্ধ করে স্খলিত করতে পারো, তাহলে এক হাজার দিরহাম ইনাম পাবে।'

মহিলাটি তখন সুন্দর ও দামী কাপড় পরে এবং উন্নতমানের সুগন্ধি ব্যবহার করে তার সামনে গিয়ে হাজির হলো। তখন রবী ইবনে খায়সাম মসজিদ থেকে বের হয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। এই উগ্র বেশে মহিলাটিকে দেখে তিনি বেশ ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন–

'আচ্ছা বলো তো, কী অবস্থা হবে তোমার– এখন যদি তুমি এমন জ্বরে আক্রান্ত হও, যা তোমার দেহের সব রূপ-রস-গন্ধ কেড়ে নিয়ে যাবে?

অথবা এমন যদি হয় 'মালাকুল মাওত' বা মৃত্যুর ফেরেশতা এসে তোমার হৃদপিণ্ডের ধমনীকে বন্ধ করে দেয়? কিংবা ধরো যদি 'মুনকির-নাকির' তোমার সাথে এখন 'মন্দ ব্যবহার' করে?'

তখন যুবতীটি চীৎকার করে কেঁদে উঠলো এবং তাঁর সামনে থেকে দ্রুত চলে গেলো। তারপর সম্পূর্ণভাবেই বদলে গেলো তার জীবনের ধারা

ইবাদতে ইবাদতেই কাটতো তার বেশী বেলা। একেবারে মৃত্যু পর্যন্ত।"

আজ্জালী তার ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন–

'এক রূপবতী মহিলা বাস করতো মক্কায়। তার স্বামী-সংসার ছিলো। একদিন সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে স্বামীকে বললো–

'বলো তো, এ চেহারা দেখে কে না আসক্ত হবে?'

স্বামী বললো–

'ঠিকই বলেছো!'

স্ত্রী বললো–

'কে আসক্ত হতে পারে?'

স্বামী বললো–

'সবাই! এমনকি উবায়দ ইবনে উমায়েরও! সারাক্ষণ যিনি কা'বা আঙ্গিনায় ইবাদতে মশগুল থাকেন।'

স্ত্রী এবার বললো–

'আচ্ছা, আমি যদি সত্যি সত্যি তাকে আকৃষ্ট করতে আমার চেহারা তার সামনে মেলে ধরি, তুমি কি অনুমতি দেবে?'

স্বামী বললো–

'হ্যাঁ পারলে করো!'

মহিলাটি তখন মাসআলা জিজ্ঞাসা করার ছুতোয় মসজিদুল হারামের এক কোণে তার সাথে দেখা করলো। সুযোগ বুঝে হঠাৎ নিজের চেহারা তার সামনে 'ফোকাস' করলো। এক ফালি চাঁদের ন্যায়! তখন তিনি তাকে বললেন–

'হে আল্লাহর বান্দী! তোমার চেহারা আবৃত করো! আল্লাহকে ভয় করো!'

তখন মহিলাটি উত্তর দিলো–

'আমি আপনার সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ! আমি আপনার প্রেমে পড়েছি!!'

তিনি তখন বললেন–

'শোনো! আমি তোমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। যদি সঠিক উত্তর দাও, তাহলে আমি তোমার বিষয়টি ভেবে দেখবো।'

মহিলাটি তখন বললো–

'যা জানতে চান বলুন। আমি সত্যই বলবো।'

তিনি বললেন–

'যদি 'মালাকুল মওত' এসে পড়তো তোমার রূহ কবজ করতে, তাহলে তুমি কি সেই অবস্থায় চাইতে– আমি তোমার প্রেমের ডাকে সাড়া দিই?'

মহিলাটি বললো–

'না।'

তিনি বললেন–

'তোমাকে যদি কবরে 'মনকি-নকিরের' প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যে বসানো হতো, তখন কি তুমি চাইতে আমি তোমার কু-প্রবৃত্তির ডাকে সাড়া দিই?'

সে বললো–

'অসম্ভব!'

তিনি বললেন–

'হাশরের মাঠে যখন মানুষের আমলনামা দেওয়া হবে, তখন তোমার জানা নেই, কোন্ হাতে তোমার আমলনামা লাভ করবে তুমি– ডান হাতে না বাম হাতে– তখন কি তুমি আমার সামনে এমন রূপ-অস্ত্র নিয়ে আমাকে কাবু করতে আসতে?'

সে বললো–

'না, কিছুতেই না!'

তিনি বললেন–

'হাশরের ময়দানে যখন মানুষের নেকী-বদী (পাপ-পুণ্য) মাপা হবে, তোমার জানা নেই– হালকা হবে তোমার পাল্লা না ভারী হবে, তখন কি পারতে রূপের এমন বড়াই নিয়ে আমাকে এসে বিভ্রান্ত করতে?'

সে বললো–

'কল্পনাই করা যায় না!'

তিনি তখন বললেন– 'মনে করো, তুমি যদি দাঁড়াতে আল্লাহর সামনে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে, তখন, সেই মুহূর্তে এখন যে উদ্দেশ্যে এসেছো, তখন তা পারতে?'

সে বললো–

'তা কী করে হয়?'

তিনি এবার বললেন–

'তাহলে হে আল্লাহ্র বান্দী! আল্লাহকে ভয় করো! আল্লাহ তোমাকে কতো নেয়ামত দান করেছেন, তার শোকর আদায় করো। আল্লাহ্র নেয়ামত নিয়ে ঠাট্টা করো না।'

মহিলাটি তখন স্বামীর কাছে ফিরে গেলো। যেতেই স্বামী জানতে চাইলো–

'কী করে এলে?'

জবাবে মহিলা বললো–

'আমরা সবাই এখানে নিষ্কর্ম! অথচ মানুষ ইবাদত করছে। আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহ করছে! আমরা এ অবস্থায় আর বসে থাকতে পারি না!'

এরপর থেকে তাঁর ইবাদত-বন্দেগী সীমাহীন বেড়ে গেলো। কখনো সে সালাতে নিমগ্ন। কখনো সিয়াম সাধনায় কেটে যাচ্ছে দিনের পর দিন। মুখাবয়বে ভেসে বেড়াতো একটা অতৃপ্তি– 'আমি কি আমার রব-এর হুকুম ঠিকমতো আদায় করছি?'

হে নারী! এমন যদি হয়,
সুসংবাদ তোমার নিত্য সঙ্গী!!

যখনই নারী সৃষ্টিকর্তার সাথে নিজের সম্পর্ক ও পরিচয় গভীর করবে, তাঁকে মনে-প্রাণে ও কাজে-কর্মে ভয় করবে, কিংবা পাপ ও অনাচার থেকে বেঁচে থাকবে, কখনো পাপ হয়ে গেলে সাথে সাথে তাওবা করবে, আল্লাহ্র

দিকে ফিরে যাবে, ভয় করবে পাপের ভয়ঙ্কর পরিণামকে, বর্জন করবে ক্ষণিকের পাপময় স্বাদ-আস্বাদকে– এবং এ সবই করবে শুধু আল্লাহকে রাজি ও খুশি করার জন্যে, তাহলে আল্লাহ তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন। তার দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রাখবেন। বান্দা আল্লাহর কাছে তাওবা করলে আল্লাহ ভীষণ খুশি হন। বোখারী ও মুসলিম শরীফে এক মহিলা সাহাবীর তাওবার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে–

তিনি ছিলেন বিবাহিতা। থাকতেন মদীনায়। একদিন তাঁকেই শয়তান দিলো কু-মন্ত্রণা। এক লোকের প্রতি তাঁর হৃদয় আসক্ত হলো। লোকটিও আগে বাড়লো। এক সুযোগে লোকটি তাঁকে নিয়ে এক নির্জন স্থানে গেলো। সেখানে তাঁরা দু'জন ছাড়া আর কেউ ছিলো না। অবশ্য শয়তান ছিলো। শয়তান তো থাকবেই। কারণ নির্জনে দুই নারী-পুরুষ একত্র হলে শয়তান সেখানে এসে হাজির হবেই। এটা তার 'মিশন'। এখানেও তাই হলো। ফলে চোখের আড়ালে থেকে শয়তান ঐ দুজনকে ধীরে ধীরে পরস্পরের প্রতি মোহিত ও প্রলুব্ধ করতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত তাঁরা শয়তানের ফাঁদে পা দিলো। ব্যভিচারে লিপ্ত হলো!

মহিলাটি কোনো সাধারণ মহিলা ছিলেন না। ছিলেন নবীজীর সান্নিধ্যধন্যা সাহাবিয়্যাহ। তাই একটু পরই তাঁর হুঁশ হলো। ততোক্ষণে শয়তান তার শয়তানী করে চলে গেছে। পাপ কাজ সংঘটিত করে শয়তান আর থাকে না। অন্যত্র গিয়ে নতুন ফাঁদ পাতে। এখানেও তাই হলো। শয়তান চলে যাওয়ার পর মহিলার ভিতরে তোলপাড় শুরু হলো। পাপবোধে তাঁর মন-মানস অন্ধকার হয়ে গেলো। নিজের অস্তিত্বকে অসহ্য মনে হতে লাগলো। তিনি শ্বাস-নিশ্বাস ঠিকই নিতে পারছেন। তবুও যেনো তাঁর দম আটকে যাচ্ছে। হৃদয়টা পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। কোথাও বসতে ইচ্ছে করছে না। কোথাও দাঁড়াতেও ইচ্ছে করছে না। কিছু খেতেও ইচ্ছে করছে না। কারো সাথে কথা বলতেও ভালো লাগছে না। এভাবে আর কিছুক্ষণ থাকলেই যেনো তিনি মারা যাবেন। তাই আর দেরী করলেন না। দ্রুত ছুটে গেলেন চিকিৎসা নিতে– চিকিৎসাকেন্দ্রে। সায়্যিদুল মুরসালিনের কাছে। রহমাতুল-লিল-আলামীন-এর কাছে। শোনা গেলো তাঁর উদ্বেগাকুল কণ্ঠ–

يا رسول الله .. زنيت .. فطهرني ..

'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি যিনায় লিপ্ত হয়েছি। আমাকে জলদি পবিত্র করুন!'

আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কথা শুনেও শুনলেন না। মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু যেদিকে নবীজী মুখ ফিরিয়ে নিলেন সে দিকে গিয়ে তিনি আবার বললেন–

يا رسول الله .. زنيت .. فطهرني ..

'হে আল্লাহর রাসূল! আমি যিনায় লিপ্ত হয়েছি। আমাকে জলদি পবিত্র করুন!'

আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তিনি এমনটি করলেন এ উদ্দেশ্যে যে, যেনো মহিলাটি ফিরে গিয়ে খাঁটি হৃদয়ে তাওবা করে। আল্লাহ্র কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে এবং পেয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। মহিলাটি এরপর চলে গেলেও পাপবোধের অসহ্য আগুনে দগ্ধ হচ্ছিলেন। তাঁর কিছুই ভালো লাগছিলো না। ধৈর্যের বাঁধ বারবার ভেঙে যেতে লাগলো। পরদিন নবীজী যখন মজলিসে বসলেন, তখন আবার গিয়ে তিনি তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। বললেন–

يا رسول الله .. زنيت .. فطهرني ..

'হে আল্লাহর রাসূল! আমি যিনায় লিপ্ত হয়েছি। আমাকে জলদি পবিত্র করুন!'

আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবারও মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন তিনি বলে উঠলেন–

'হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি আমাকে ফিরিয়ে দেবেন, যেমন ফিরিয়ে দিয়েছেন মায়েজকে? আল্লাহ্র কসম! ব্যভিচারজনিত কারণে আমি গর্ভধারিণী!'

আল্লাহ্র রাসূল এবার তাঁর দিকে তাকালেন। বললেন–

'এখন নয়, এখন চলে যাও! সন্তান জন্ম দেওয়ার পর এসো।'

তখন তিনি মসজিদ থেকে বের হয়ে চলে গেলেন। পা চলতে চায় না, তবু পা টেনে টেনে তিনি গৃহে ফিরলেন। দুশ্চিন্তা দিন দিন বেড়েই চললো।

শরীর ভেঙে পড়লো। অনুতাপ-দগ্ধ হৃদয় থেকে উৎসারিত অবিরত অশ্রুধারা জারি থাকলো। দিন গুনতে লাগলেন। অপেক্ষার কঠিন কঠিন দিন। শেষ হতেই চায় না। জন্ম নেয় মনের মাটিতে বেদনার বৃক্ষ। তাওবা ছাড়া মৃত্যুর আশঙ্কায় বারবার কেঁপে উঠে সে বেদনা-বৃক্ষের ডালপালা।

এক সময় ফুরালো অপেক্ষার 'নীল প্রহর'। এলো প্রসবকাল। এলো সন্তান। সন্তান প্রসবের পর তাঁর আর তর সইলো না। ছুটে গেলেন নবজাতককে কোলে করেই— আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে। গিয়েই নবজাতককে রাখলেন তাঁর সামনে। তারপর বললেন—

يا رسول الله .. زنيت .. فطهرني ..

'হে আল্লাহর রাসূল! আমি যিনায় লিপ্ত হয়েছি। আমাকে জলদি পবিত্র করুন!'

দয়া ও করুণার নবী তাকালেন তাঁর দিকে। দেখলেন তাঁর দূরাবস্থা। তাঁর দুশ্চিন্তা ও অনুশোচনাঘেরা ক্লান্তি ও ব্যাকুলতা। তারপর তাকালেন শিশুটির দিকে। দুগ্ধপুষ্য শিশু! কেমনে চলবে মা-বিহীন? তাই বললেন—

'ফিরে যাও! দুধ পান করাতে থাকো! দুধ ছাড়ানোর পর এসো!'

আবার চলে গেলেন তিনি। আবার ফিরে গেলেন তিনি। এবার শুরু হলো দুধ পান করানোর কঠিন দু'টি বছর। সহজে কি শেষ হতে চায়? নবজাতকের মায়াভরা মুখ দেখে দেখে, নীরব অশ্রুপাতের উষ্ণধারায় তার চেহারা মুছে মুছে, 'বিদায়ী চাহনি'র ছলোছলো অভিব্যক্তিতে তাকে প্রতিদিন বিদায় জানাতে জানাতে এক সময় শেষ হয়ে এলো তাঁর অপেক্ষার বেলা। তাকে কোলে নিয়ে ছুটে গেলেন তিনি আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকটে। থামলেন গিয়ে তাঁর সামনে। বললেন—

'হে আল্লাহ্র নবী! এই যে আমি এর দুধ ছাড়িয়ে এসেছি! এবার আমাকে পবিত্র করুন!'

আল্লাহ্র নবী তখন তাঁর সন্তানটিকে একজনের দায়িত্বে দিয়ে তাঁকে বুক পর্যন্ত মাটিতে গেড়ে প্রস্তরাঘাতের নির্দেশ দিলেন! প্রস্তরাঘাতে তাঁর মৃত্যু

হলো!!

হ্যাঁ, তিনি মারা গেছেন! কিন্তু তাঁকে গোসল দেয়া হয়েছে। দাফন করা হয়েছে। আল্লাহর নবী স্বয়ং তাঁর জানাযা পড়িয়েছেন। আর বলেছেন–

'সে এমন তাওবা করেছে, যা মদীনার সত্তরজন তাওবাকারীর মাঝে বন্টন করে দেয়া যাবে!'

পাবে কি তুমি এমন কাউকে, যে তাওবার পথে নিজের জীবনটাই বিলিয়ে দিয়েছে?! স্বেচ্ছায়? সাগ্রহে?! এমন মরণ, কার ভাগ্য– করে বরণ?

হে মহিয়সী! ধন্য তুমি ধন্য! লিপ্ত হয়েছিলে ব্যভিচারে! ছিন্ন করে দিয়েছিলে আল্লাহর পর্দা! তারপর? তারপর অন্ধকার থেকে শুধু আলোর দিকে ছোটা!'

ব্যভিচার! ওহ! কী ভয়ঙ্কর ও পৈশাচিক কাজ! ক্ষণিকের 'লয্‌যত' দূর হয়ে গেলে– কী থাকে আর দীর্ঘশ্বাস ও নীল বেদনার যন্ত্রণা ছাড়া? পরকালে সাক্ষি দেবে যখন মানুষের হাত-পা বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তখন গোপন থাকবে কি ব্যভিচারের কথা? সাক্ষি দেবে পা, সাক্ষি দেবে হাত, সাক্ষি দেবে জিহ্বা, বরং সাক্ষি দেবে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। বাঁচার কোনো উপায় নেই। সুতরাং দুনিয়াতেই বাঁচতে হবে– এ কু-কর্ম থেকে। লাভ করতে হলে পরকাল, তার অফুরন্ত নেয়ামত। ভয় করতে হবে জাহান্নামের কঠিন আগুন, কঠিন শাস্তি। সে দিন ব্যভিচারী নারী-পুরুষকে হাঁটুর পেছন দিকের পেশীতন্ত্রের সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হবে জাহান্নামে। চলতে থাকবে লোহার বেত্রাঘাত। প্রহারে প্রহারে অতিষ্ঠ হয়ে যখন তাদের কেউ পানাহ চাইবে, তখন ফেরেশতারা ঘোষণা করবে–

> أين كان هذا الصوت وأنت تضحك.. وتفرح..
> وتمرح.. ولا تراقب الله ولا تستحي منه..!!
>
> 'কোথায় ছিলো তোমার এ কণ্ঠ, যখন 'বন্য আনন্দে' হাবুডুবু খাচ্ছিলে? না পরোয়া করছিলো আল্লাহকে না কপাল কুঞ্চিত হয়েছিলো লজ্জায়?!'

বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীস। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

يا أمة محمد.. والله إنه لا أحد أغير من الله.. أن يزني عبده.. أو تزني أمته.. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم.. لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً.

'হে উম্মতে মুহাম্মদী! আল্লাহর কোনো বান্দা বা বান্দী ব্যভিচারে লিপ্ত হলে আল্লাহর 'আত্মসম্মান' কেঁপে কেঁপে উঠে। আল্লাহ যে সবচে' বড় আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন! হে উম্মতে মুহাম্মদী! আমি যতো গভীরের জিনিস জানি, তোমরা তা জানলে কমই হাসতে, কেবল কাঁদতে আর কাঁদতে!'

তাকাও তোমার আশ-পাশে!!

এমনই ছিলেন সে যুগের নারীরা। পাপ হয়েছে, সাথে সাথে এসেছে তাওবাও, অনুশোচনাও। কিন্তু একটু ভাবো তো বর্তমান যুগের নারীদেরকে নিয়ে? তাদের মধ্য থেকে কতোজনের পা ফসকে গেছে, স্খলিত হয়েছে– পাপাচারের পিচ্ছিল জগতে, বরং তাদের আশ-পাশে শয়তান জায়গা করে নিয়েছে বেশ স্বচ্ছন্দে, তারপর তাদেরকে বিপথগামী করেছে, বের করে নিয়েছে ইসলামের সুসংরক্ষিত সীমানা থেকে, বাধ্য করেছে মূর্তিপূজায়। তখন নামাজ তরক করেছে তারা। নামাজের গুরুত্ব মূল্যহীন হয়ে পড়েছে তাদের কাছে। অথচ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر

'আমাদের এবং কাফেরদের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয়কারী জিনিস হলো– নামাজ। সুতরাং যে নামাজ তরক করলো সে কুফরী করলো।'

এখন এসো, একটু ঘুরে আসি পরকাল থেকে। যাবে? হ্যাঁ, এগিয়ে যাও! আরো সামনে যাও! তারপর জান্নাতবাসী ও জাহান্নামী সম্পর্কে আল্লাহ কী বলেছেন– তা নিয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা করো!

জান্নাতবাসীরা যখন জান্নাতে বসে জান্নাতের সুখ-আনন্দ ও ভোগ-বিলাসে পরিপ্লুত ও পরিতৃপ্ত হতে থাকবে, তখন তাদের মনে পড়ে যাবে দুনিয়ার জীবনের কিছু সাথী সঙ্গীর কথা। আল্লাহর অবাধ্যাচরণ ও নাফরমানিতেই কাটতো যাদের সারাবেলা। ওরা কেমন আছে এখন কে জানে!

ফেরেশতারা বোঝে কখন জান্নাতীরা কী চায়। জান্নাতীদের এ মনের কথাও তাদের কাছে অবিদিত থাকবে না। ফেরেশতারা সাথে সাথেই জান্নাতবাসীদেরকে জানাবে যে— তারা খুব কষ্টে আছে! জাহান্নামের আগুনে পুড়ছে। জাক্কুম ভক্ষণ করছে। শয়তানের সাথেই ওদেরকে শৃঙ্খলিত করে রাখা হয়েছে।

জান্নাতবাসীদের কৌতূহল তখন বেড়ে যায়। তারা উঁকি দেয়— জান্নাতের খিড়কি দিয়ে! জিজ্ঞাসা করে সেই জাহান্নামীদেরকে—

-مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (তোমাদেরকে কিসে সাকার-এ নিক্ষেপ করেছে?')

আল্লাহ বলেন—

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ. إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ. فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ. عَنِ الْمُجْرِمِينَ. مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ.

'প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ। তবে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণ ব্যতিত। তারা থাকবে উদ্যানে (জান্নাতে), তারা জিজ্ঞাসা করবে অপরাধীদের সম্পর্কে— তোমাদেরকে কিসে সাকার-এ নিক্ষেপ করেছে?'

হ্যাঁ, প্রশ্নই বটে! বলো—مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (তোমাদেরকে কিসে সাকার-এ নিক্ষেপ করেছে?')

এবার জবাব শোনো!

প্রথমতঃ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (তারা বলবে, আমরা নামাজীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলাম না।)

দ্বিতীয়তঃ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (আমরা অভাবগ্রস্তকে আহার দিতাম না।)

তৃতীয়তঃ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (আমরা আলোচনাকারীদের সাথে

আলোচনা করতাম।) অর্থাৎ ওরা যা করতো আমরা তা-ই করতাম। তারা নামাজ ছেড়ে দিলে আমরাও নামাজ ছেড়ে দিতাম। তারা আল্লাহ্র নাফরমানি করলে আমরাও আল্লাহ্র নাফরমানি করতাম। ওরা গান ধরলে আমরাও গান গাইতাম। ওরা ধুমপান করলে আমরাও ধুমপান করতাম। ওরা নামাজ বাদ দিয়ে ঘুমালে আমরাও ঘুমাতাম। ওরা পিতা-মাতাকে কষ্ট দিলে আমরাও কষ্ট দিতাম।

চতুর্থতঃ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ (আমরা কর্মফল দিবস অস্বীকার করতাম। আমাদের নিকট মৃত্যু আগমন করা পর্যন্ত)।

আল্লাহ বলবেন– فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (ফলে সুপারিশকারীর সুপারিশ তাদের কোনো কাজে লাগবে না।')

হ্যাঁ, আল্লাহ্র কসম! যদি সমস্ত নবী-রাসূল একত্রিত হন এবং তাঁদের সাথে থাকেন ফেরেশতারা তারপর কোনো কাফেরের জন্যে সবাই মিলে সুপারিশ করেন, তবুও আল্লাহ তাঁদের সুপারিশ কবুল করবেন না। কাফেরদের পক্ষে কারো কোনো সুপারিশ সেদিন চলবে না।

আমি কার আনুগত্য করবো?

হিজাব ও পর্দাকে যে সব দেশ না জেনে না চেনে ঘৃণা করে, তেমন এক দেশেরই একটি ঘটনা।

হিন্দা ছিলো ছোট্ট এক কিশোরী। স্কুলে যাওয়া-আসা করতো লম্বা ও শালীন পোষাক পরে। কিন্তু এ-পোষাকে শিক্ষিকা ওকে দেখলেই রাগ করতেন। বলতেন–

'এ সব চলবে না। তোমাকে সবার মতো খাটো পোষাকে স্কুলে আসতে হবে। বুঝলে?'

একদিন শিক্ষিকা একটু বেশীই রেগে গেলেন। হিন্দার মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো। ও কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরলো। এসে মাকে জানালো–

'শিক্ষিকা আমাকে আমার লম্বা পোষাকের জন্যে স্কুল থেকে বের করে দিয়েছেন!'

মা বললেন–

'আমার মা মণি! মন শক্ত রাখো! তুমি যে পোষাক পরছো তা আল্লাহ্র হুকুম। শিক্ষিকা রাগ করুক আর যাই করুক– এ পোষাক তুমি ছাড়তে পারো না!'

'তা তো বুঝলাম! কিন্তু শিক্ষিকা যে মানছেন না?'

'ভেবে দেখো, কার কথা শুনবে তুমি– শিক্ষিকার কথা না আল্লাহ্র কথা! আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সুন্দর আকৃতি দান করেছেন। তোমাকে অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন। মানতে হলে আল্লাহ্র হুকুমই মানতে হবে– কোনো মানুষের হুকুম নয়! মানুষ তোমার কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারবে না– আল্লাহ না চাইলে।'

মেয়েটি তখন মাকে জানালো–

'আমি আল্লাহ্র কথাই শুনবো। তাঁর হুকুমই পালন করবো।'

পরদিন মেয়েটি স্কুলে গেলো। আগের সেই লম্বা ও শালীন পোষাক পরেই। শিক্ষিকা ওকে দেখা মাত্রই কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা শুরু করলেন। মেয়েটি কেঁদে ফেললো। বললো–

'জানি না, আমি কার আনুগত্য করবো? আপনার না তাঁর!'

শিক্ষিকা বললেন–

'তাঁর মানে কার?'

কিশোরীটি তখন বললো–

'আল্লাহ্র! আমি যদি আপনার আনুগত্য করি তাহলে আমার আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন আর আমার আল্লাহ্র কথা মানলে আপনি অসন্তুষ্ট হবেন। তাহলে আমি কী করবো?'

এ কথা শোনার সাথে সাথেই শিক্ষিকা কান্নায় ভেঙে পড়লেন এবং সাথে সাথে খাঁটি দিলে তাওবা করলেন। অশ্রুসিক্ত চোখে এবং বাকরুদ্ধ কণ্ঠে সস্নেহে প্রিয় ছাত্রীকে বললেন–

'তুমি বরং আল্লাহ্র আনুগত্যই করবে! শুধু আল্লাহ্র আনুগত্য!!'

কিন্তু তুমি? তুমি হে নারী? তুমি কার অনুসরণ করবে?

পাশ্চাত্যের চাপিয়ে দেয়া 'ফ্যাশন'-এর না ইসলামের শাশ্বত বিধান হিজাবের? অবশ্যই হিজাবের! এতে যদি তোমার শিক্ষিকা তোমাকে ক্লাস থেকে বের করে দেন, হাসতে হাসতে বের হয়ে এসো! বুকটা গরবে ফুলিয়ে বের হয়ে এসো! এমন শিক্ষিকার কাছে কেনো পড়বে তুমি– যিনি তোমাকে আল্লাহর হুকুম মানতে বারণ করবে? পর্দাকে বিদ্রূপ করবে? এমন শিক্ষিকার কবল থেকে আল্লাহ যে তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন– এ জন্যেই হাসবে, গর্ব অনুভব করবে। দুনিয়ার পড়া দুনিয়াদারের কাছে পড়তে গিয়ে যদি দ্বীনই সংরক্ষিত না থাকলো, তাহলে এমন পড়াকে হাসতে হাসতেই 'বিদায়' বলো! কাঁদবে না! কাঁদলে তুমি পরাজিত হবে। কান্না কি তোমার শোভা পায়? তুমি তো দ্বীন পালনের জন্যে দুনিয়াকে হারিয়েছো! দ্বীন পেয়ে দুনিয়া হারিয়ে হাসবে না দ্বীন হারিয়ে দুনিয়া পেয়ে হাসবে? কখন হাসবে?

কবরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে এক মহিলা..

মহিলার ভাষ্য–

'আমরা এক পারিবারিক সফর শেষে মাগরিবের একটু আগে বাড়ি ফিরছিলাম। আমার স্বামী এক কবরস্থানের প্রাচীর-বেষ্টনীর কাছে অবস্থিত একটা মসজিদের কাছে গাড়ী থামিয়ে একটু নামলেন। তখন রাত নেমে এসেছে। আমি বসে আছি গাড়িতে একাকী। হঠাৎ অনুভব করলাম– আমার শরীর কাঁপছে। মনে হলো– যেনো মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। একটু পরই দুনিয়াকে বিদায় জানাতে হবে। আমি তাকালাম কবরস্থানের দিকে। হায়! দুনিয়া কতো ক্ষণস্থায়ী। কতো আপনজন এর মধ্যেই ছেড়ে গেছে দুনিয়া। কয়েকদিন আগেও তারা মাটির উপরে ছিলো। আজ তারা মাটির নীচে। প্রতিদিন হাজার হাজার জানাযা। তারা সাদা কাপড়ে আবৃত হয়ে চলে যাচ্ছে কবর দেশে, মাটির ঘরে। সেখানে একাই মুখোমুখি হতে হচ্ছে শেষ পরিণতির। ভালো কিংবা মন্দ। ভালো হলে তার কোনো শেষ নেই। মন্দ হলেও তার কোনো কিনারা নেই। আত্মীয়-স্বজন কিছুদিন তাদেরকে মনে রাখে। তাদের স্মরণে অশ্রু ফেলে। এক সময় ভুলে যায়।

এই তো এ-প্রাচীরের আড়ালে শুয়ে আছে কতো মানুষ! কেউ ছিলেন

আমীর, কেউ ফকির। কেউ মনিব, কেউ গোলাম। কেউ রাজা, কেউ প্রজা। কেউ দুর্বল, কেউ সবল। কেউ জালিম, কেউ মজলুম। এখানে এসে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সকল পার্থিব পরিচয়। কিন্তু নেকি ও বদি'র বদলা সবাই পাবে এখানে।

হে আল্লাহ! এখন যদি আমার জীবন-স্পন্দন থেমে যায়, বাড়িতে আমার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে যদি সমাহিত হই এখানে কোনো সঙ্কীর্ণ কবরে, যেখানে নেই কোনো সুজন-স্বজন, নেই কোনো প্রিয় মানুষ ও ঘনিষ্ঠজনের পরশ। আছে শুধু অন্ধকার। মনকির নকিরের প্রশ্নবাণ। কঠিন জিজ্ঞাসাবাদ। আর আমার পরিবার পরিজন? ভেজা চোখে ওরা আমাকে মাটিচাপা দিয়ে ধীরে ধীরে চলে যাবে। কিছুদিন পর ভুলে যাবে আমার স্মৃতি। একেবারে ভুলে যাবে। আল্লাহ সত্য বলেছেন–

وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا

'কেয়ামতের দিন সবাই তার নিকট আসবে একাকী অবস্থায়।'

শেষে তোমাকে যা বলতে চাই–

হে সুরক্ষিত জহরত!

হ্যাঁ, তোমার কানে কানে কিছু কথা বলে আমি এবার বিদায় নেবো। আশা করি আমার কথা তোমার কান স্পর্শ করার আগে তোমার হৃদয় স্পর্শ করবে।

সংখ্যায় যতোই বাড়ুক– পাপাচারিণীরা– তুমি বিভ্রান্ত হবে না! পর্দা নিয়ে যারা অবহেলা করে কিংবা বাঁকা কথা বলে, কিংবা যুবকদেরকে ধরতে ফাঁদ পাতে, কিংবা অবৈধ প্রণয়ের অন্ধকার পৃথিবীতে হারিয়ে যায়, হারামের ভিতরে খুঁজে ফিরে 'তৃপ্তি ও শান্তি', নাটক সিনেমায় কাটিয়ে দেয় জীবনের মহা মূল্যবান সময়, জীবন যাপন করে লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন, তাদের সংখ্যাধিক্যেও তুমি ভেঙে পড়বে না, বিভ্রান্ত হবে না। পরিষ্কার ভাষায় তোমাকে বলতে চাই–

আমরা বাস করছি এমন এক যুগে, যখন ফেতনা-ফাসাদের জয়জয়কার সর্বত্র। মু'মিনের সঙ্কট সবখানে বিভিন্ন আকৃতিতে। এখানে চোখের ফেতনা। ওখানে কানের ফেতনা। এখানে একজন পসরা মেলে বসেছে অশ্লীলতার। ওখানে একজন দোকান খুলেছে পাপাচারের। কেউ আবার ডাকছে– অবৈধ মালের দিকে। পাপের বাজারের রমরমা অবস্থা দেখে মনে হয়– আমাদের যুগটা যেনো সে যুগেরই কাছে চলে এসেছে, যে যুগ সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে গেছেন–

فإن وراءكم أيام الصبر .. الصبر فيهن كقبض على الجمر .. للعامل فيهن أجر خمسين منكم ..

'তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে– ধৈর্যের দিন। তখন ধৈর্য ধরা মানে হাতের মুঠোয় কয়লা ধরে রাখা। তখন সৎ কাজের বিনিময় হবে এখন থেকে পঞ্চাশগুণ বেশী।'

শেষ জামানায় সৎ আমলকারীর বিনিময় অনেক বেড়ে যাবে। কেননা, তখন সৎ কাজে কোনো বন্ধু পাওয়া যাবে না। সাহায্যকারী মিলবে না। পাপাচারদের জয়জয়কারে নেক আমলকারী হবে নিঃসঙ্গ, অপরিচিত। নিঃসঙ্গই বটে। পাপাচারীরা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে পাপাচার করবে আর নেক আমলকারী তাদের দাপট ও ভিড়ে শুধু নীরবে কাঁদবে।

তারা গান শুনবে। গানের আসর বসাবে।

আর নেক আমলকারী গান শুনবেন না,

আসরও বসাবেন না।

তারা পরনারীকে দেখে দেখে চোখের জ্বালা মেটাবে।

আর নেক আমলকারী আনত চোখে নীরবে পথ চলবেন।

তারা লিপ্ত হবে– যাদুবিদ্যা চর্চায় ও শিরকে,

আর নেক আমলকারী অটল-অবিচল থাকবে ঈমান ইয়াকিন ও তাওহীদে।

মুসলিম শরীফের হাদীস। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

بدأ الإسلام غريباً .. وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء

'ইসলাম শুরু হয়েছিলো অপরিচিত ও অচেনা অবস্থায়। আবার ইসলাম ফিরে যাবে আগের সেই নিজের অবস্থায়। কিন্তু সুসংবাদ ইসলামকে আকড়ে ধরে থাকা সেই অপরিচিত, অবহেলিত উপেক্ষিত ও অচেনাদের জন্যেই!'

বোখারী শরীফের হাদীস। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

إنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم

'যে সময়ই আসবে তোমাদের সামনে তা আগের সময়ের তুলনায় আরো খারাপ ও আরো ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ হবে। এ অবস্থা চলতে থাকবে তোমাদের প্রতিপালকের সাথে তোমাদের সাক্ষাত (মৃত্যু) পর্যন্ত।'

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে-

আল্লাহ তা'আলা বলবেন-

وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين .. إذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة .. وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة.

'কসম আমার ইজ্জতের! আমার বান্দার উপর এক সঙ্গে আমি দু'টি ভয় একত্রিত করবো না। দু'টি সুখ বা নিরাপত্তাও একত্রিত করবো না। দুনিয়াতে আমাকে ভুলে গিয়ে সে যদি নিরুদ্বেগ থাকে, তাহলে কেয়ামতের দিন আমি তাকে ভয়ের মুখোমুখি করবো। আর দুনিয়াতে যদি সে আমাকে ভয় করে, তাহলে আমি আখেরাতে তাকে সুখ ও নিরাপত্তা দান করবো।'

হ্যাঁ, যে আল্লাহকে ভয় করবে ইহকালে, মর্যাদা দেবে হালালকে হালাল হিসাবে আর হারামকে হারাম হিসাবে, সে কেয়ামতের দিন নিরাপদ থাকবে। আল্লাহ্‌র দীদার লাভ করে সে ধন্য হবে। অবশ্যই জান্নাত হবে তার শেষ ঠিকানা।

এই জান্নাতবাসীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন–

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ.

'তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তারা বলবে– আমরা ইতিপূর্বে নিজেদের বাসগৃহে ভীত-কম্পিত ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ্‌ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। আমরা পূর্বেও আল্লাহকে ডাকতাম। তিনি সৌজন্যশীল, পরম দয়ালু।'

পক্ষান্তরে যারা অপরাধে গা ভাসিয়ে দেবে, যাদের দিবা-নিশির চিন্তা হবে– পেট-লালসা ও যৌন-লালসা এবং আল্লাহ্‌র শাস্তির ব্যাপারে যারা হবে ভ্রুক্ষেপহীন ও বেপরোয়া, আখেরাতের ভয়ঙ্কর পরিণতি তাদেরক গ্রাস করবেই।

আল্লাহ্‌ বলেছেন–

تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ.

'তুমি জালিমদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবে তাদের কৃতকর্মের জন্যে; আর ইহাই আপতিত হবে তাদের উপর। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারা থাকবে জান্নাতের মনোরম স্থানে। তারা যা চাইবে তাদের

প্রতিপালকের নিকট তাই পাবে। এ হলো মহা অনুগ্রহ।

সুতরাং বিভ্রান্ত হয়ো না। ভয়ও পেয়ো না।

যদি দেখো– স্খলিত ও পথহারা নারীদের সংখ্যাই বেশী আর দীনের উপর অটল-অবিচল মহিয়সীদের খুঁজে খুঁজে বের করতে হয়, তাহলেও তুমি ভেঙ্গে পড়ো না।

আর যদি দেখো– আধ্যাত্মিকতার সোপান বেয়ে বেয়ে উপরে উঠা নারীদের সংখ্যাও একেবারে কম, তাহলেও তুমি একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতা অনুভব করো না।

হে আদর্শ প্রজন্ম গড়ার শিল্পী!

হে শ্রেষ্ঠ মানুষ গড়ার পুণ্যব্রতী!

হে সমাজ গড়ার মালিকান!

আমার এই উপদেশমালা সঁপে দিলাম তোমার হাতে। আমার গোপন ও লুক্কায়িত সংগ্রহশালা থেকে– কুড়িয়ে কুড়িয়ে। এ গুলো প্রাণঢালা উপদেশমালা। কোনো ভেজাল নেই তাতে, নেই কোনো ভণিতা। আল্লাহর কাছে আমার নিবেদন– আল্লাহ যেনো তোমাকে হিফাযত করেন। নিরাপদে রাখেন। তুমি হও এ-যুগের আয়েশা-খাদিজা। ফাতেমা-হাজেরা। যেখানেই থাকো– তুমি আমাদের বোন। এমনকি আমাদের উপদেশমালা গ্রহণ না করলেও। আমরা তোমার কল্যাণ চাই– সর্বাবস্থায়। দিবা-রাত্র সব সময় তোমার কল্যাণ চেয়ে আমরা হাত উঠাবো– আকাশের ঠিকানায়। মহান আল্লাহর দরগায়। তোমাকে উপদেশ দানে কিংবা তোমার রক্ষণাবেক্ষণে– আমরা সব সময় ক্লান্তিহীন, শ্রান্তিহীন, সংকল্পবদ্ধ। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমার কল্যাণ কামনায় আমাদের চিন্তা ও শ্রমকে নষ্ট করবেন না! তুমি যেদিন আলোর পথে উঠে আসবে এবং অন্যকেও ডাকবে, সেদিনই আমাদের মুখে হাসি ফুটবে। প্রাপ্তির হাসি। তৃপ্তির হাসি। অমলিন সেই হাসি! আমাকে তোমাকে সবাইকে তাওফীক দেবেন শুধু আল্লাহ।

সালাম তোমাকে হে নারী! সালাম! আল্লাহর রহমত হোক তোমার নিত্য পাওয়া। তাঁর বরকত হোক তোমার নিরন্তর পাথেয়!

পরিশিষ্ট

হে নারী! পর্দা তোমার অহঙ্কার

হে নারী! তুমি কি চেনো তোমাকে? তুমি সুরক্ষিত মুক্তো, তুমি সংরক্ষিত জহরত, তুমি স্নেহমাখা শীতল স্পর্শ!! তোমার ভালোবাসায় পূর্ণ আমার হৃদয়ের সকল সত্ত্বা। তোমাকে নিয়ে আমাকে ভাবতেই হয়- সারাক্ষণ .. সারাবেলা। তোমার সম্মোহনী রূপ-লাবন্যে ওড়ে যায় যে আমার আক্কল-বুদ্ধি! লোপ পায় যে বিচার-বুদ্ধি!! ঘুম আসে না দু'চোখে- কেবল জেগে রই!

মাঝে মধ্যে অস্থির বেলা কাটাই কেবল দুঃশ্চিন্তায় .. কেবল অস্থিরতায়। তোমার এই অবস্থা আমাকে দেখতে হবে তা ভাবিও নি কোনোদিন! কোনোদিন আমি ভাবি নি যে, তুমি দুশমনের পেছনে ছুটে যাবে নিজের ধ্বংস ডেকে আনতে! কেনো তুমি দুশমনের ধারালো ছুরিকে চ্যালেঞ্জ করতে গেলে? এখন যে শুধু তোমারই না- তোমার মুসলিম ভাই-বোনদের লাল রক্তেও যে ভেসে যাচ্ছে দুশমনের হাত!

হয়তো আমার কথায় তুমি ভীষণ বিস্ময়বোধ করছো। অস্বস্তিবোধ করছো। হয়তো মনে মনে ভাবছো– 'এ সব কী বলছেন আপনি?! কোথায় আমি আমার দুশমনের হাতে কতল হলাম?! এই যে কেমন সুন্দর করে আমি জীবনের রূপ-রস-গন্ধ উপভোগ করছি?! জীবনের সাজানো বাগান থেকে ফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে তার মালা গাঁথছি! সেই বাগানের প্রাণময় দৃশ্য দেখে দেখে ঘুরে বেড়াচ্ছি?! কোথায় দেখলেন দুশমনের হাতে আমার রক্ত! কোথায় রক্ত! কোথায় ছুরি?! এ নিছক আপনার কল্পনা!'

না বোন! এ মোটেই নয় আমার কল্পনা! আমি যা বলছি বোঝে-শুনেই বলছি। শোনো! কাফের-মুশরিকরাই আমাদের দুশমন। ইহুদী-খৃষ্টানরাই আমাদের দুশমন। তাদের সহযোগী ও হিতাকাঙ্খিরাও আমাদের দুশমন। তুমি আমাদের বিজয়-ইতিহাস পড়ে দেখো– আমাদের দুশমনরা কখনোই

প্রকাশ্য যুদ্ধে আমাদের সাথে পেরে উঠে নি। তারা ভালো করেই জানে– আমাদের শক্তি ও বীরত্বের কথা। তারা যমের চেয়েও বেশি ভয় পায় আমাদের জিহাদী জযবা ও বিপ্লবী চেতনাকে । এই জিহাদের ময়দানে পরাস্ত হয়ে তারা বেছে নিয়েছে অন্য পথ। ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের পথ। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের পথ। সত্যি কথা হলো এই নতুন যুদ্ধে আমরা হেরে যাচ্ছি। সফলতার সিঁড়ি বেয়ে দুশমন ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে সামনে। আমাদেরকে ক্ষত-বিক্ষত করে করে, আমাদের লাশ ফেলে ফেলে। এ পরাজয় বড়ো বিঁধে মনের মাঝে! এ অসম্মানে বড়ো ঘা লাগে বিবেকের গায়ে!! •

বোন আমার!

তুমি কি জানো- এ যুদ্ধে তাদের সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী অস্ত্র কী? এ যুদ্ধে তাদের সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী অস্ত্র হলো– মুসলিম নারী। তাদেরকে বে-পর্দা ও বেহায়াপনার দিকে প্রলুব্ধ করার নিরন্তর অপচেষ্টা ও অপকৌশল। লক্ষ্য একটাই; তা হলো মুসলিম তরুণ সম্প্রদায়কে এর মাধ্যমে বিপথগামী করা এবং তাদেরকে নৈতিক অবক্ষয় ও স্খলনের দিকে ঠেলে দেয়া। তাদেরকে ঈমানহারা করে আল্লাহর ভালোবাসা ও প্রেম থেকে বঞ্চিত করে প্রবৃত্তির নিগড়ে বন্দি করে ফেলা এবং অপসৃয়মান দুনিয়ার লোভ-লালসার দিকে মুসলিম জাতিকে ঠেলে দেয়া। ইতিহাস বলে; এ ভাবেই নষ্ট করে দেয় দুশমনরা মুসলমান তরুণ-যুবকদের চেতনা ও সংকল্প। দুর্বল করে দেয় তাদের সাহস ও হিম্মত এবং বীরকে পরিণত করে ভীতু কাপুরুষে!

বোন আমার!

দুশমন প্রথমে তোমার কাছে আসবে পোষাক নিয়ে। নিত্য-নতুন আকর্ষণীয় পোষাকের দাওয়াত নিয়ে। খুব ধীরে ধীরে তারা তোমার দিকে অগ্রসর হবে। বিভিন্ন প্রস্তাব নিয়ে, বিভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে। বন্ধু ভেবে, হিতাকাঙ্ক্ষী ভেবে তুমিও তাদের কথা, তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করতে থাকবে নিজের অজান্তেই, একেবারে অবচেতন মনে! এমন কি তাদেরকে একেবারে আপন ভেবে। এ জন্যেই একটু আগে আমি তোমাকে বলছিলাম– 'কোনোদিন আমি ভাবি নি যে, তুমি দুশমনের পেছনে ছুটে যাবে নিজের ধ্বংস ডেকে আনতে! কেনো তুমি দুশমনের ধারালো ছুরিকে চ্যালেঞ্জ করতে গেলে?

এখন যে শুধু তোমারই না- তোমার মুসলিম ভাই-বোনদের লাল রক্তেও যে ভেসে যাচ্ছে দুশমনের হাত!'

বোন আমার!

আমার বড়ো দুঃখ হয়– আমাদেরই কিছু আপনজন আমাদের সাথে উঠা-বসা করে, মুসলিম পরিচয়ে চলাফেরা করে কিন্তু হৃদয় তাদের বাঁধা আমাদের শত্রুদের সাথে। তাদের লেখা ও বক্তব্যে ঝরে পড়ে পাশ্চাত্য-প্রীতির ধর্মহীন বিষ। তাদের বাহ্যিক চাল-চলন ও বেশ-ভূষা দেখলে মনে হয়– সেই হতভাগা কাফেরের সাথে তার কোনো পার্থক্য নেই, যে দুনিয়ার জীবনেও ব্যর্থ এবং আখেরাতের জীবনেও ব্যর্থ।

এমন স্বজনকে স্বজন বলতে বড়ো ঘৃণা হয়!

এমন আপনকে আপন বলতে বড়ো কষ্ট হয়!

এমন মুসলমানকে মুসলমান বলতে বড়ো লজ্জা হয়!

তাদের কাছ থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চাই।

প্রিয় বোন আমার!

বর্তমানে মুসলিম নারীদের অধপতন দেখলে দুঃখে-বেদনায় নীল হয়ে যেতে হয়! চোখে নেমে আসে সেই নীল বেদনার অশ্রু-কাঁটা। হায়! আজ আমার বোনেরা পর্দাকে বানিয়েছে 'ফ্যাশন'। সতর ঢাকার আভরণে ধরেছে পাশ্চাত্যের নগ্নতা ও বেহায়াপনার পচন। তারা ক্রমে ক্রমে এগিয়ে চলেছে সুকুমারবৃত্তি ধ্বংসের সেই ফাঁদের দিকে, পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্যের দুশমনরা যা পেতে রেখেছে কুসুম-পাপড়ির ছাউনি দিয়ে। পর্দার নামে ইসলামে পাশ্চাত্য ধারার 'ফ্যাশন'-এর কোনো অবকাশ নেই। পর্দা এবং 'ফ্যাশন' একসঙ্গে চলতে পারে না। অকল্পনীয়।

পর্দার উৎস- স্বচ্ছ ও নির্মল। আল্লাহ্র হুকুমের সামনে আত্মসমর্পণের চেতনায় সমুজ্জ্বল। আর 'ফ্যাশন'-এর উৎস- দেহ-বল্লরী ও কায়িক সৌন্দর্য প্রদর্শনের গোপন ইচ্ছার অপবিত্র ও কুৎসিত আকাঙ্খা। ইসলাম পর্দাকে ফরজ করেছে এক মহান উদ্দেশ্যে। এর উপকারিতা অপরিসীম। পর্দা করে যে মা-বোনেরা চলে তারা এক অপার্থিব তৃপ্তির আবহে সময় কাটায়। সবকিছুতেই তারা খুঁজে পায় সুখ-শান্তি-তৃপ্তি। কোনো অভাববোধের

হাহাকার ও শূন্যতা তাদেরকে ক্ষণিকের তরেও পীড়িত করে না। তাদের পর্দার সৌন্দর্য ছেয়ে যায়, ছাপিয়ে যায় সকল সৌন্দর্যকে। কারণ, 'ফ্যাশন'-এর সৌন্দর্য যে কেন্দ্রিভূত কেবল মানুষের দৃষ্টি ও ভালোবাসা লাভ করার বল্লাহারা অপরিচ্ছন্ন কামনায়! অপরদিকে পর্দার সৌন্দর্য বাঙময় হয়ে উঠে নারীমনের নিভৃত কোণে আল্লাহর রিযা ও সন্তুষ্টি লাভের পরম চাওয়ায়!!

নারীর জন্যে আল্লাহ পর্দা ফরজ করেছেন নারী যাতে নিজেকে, নিজের রূপকে আড়াল করে রাখতে পারে–

পর-পুরুষ থেকে।

তার সতীত্বের দুশমন থেকে।

মানবতার হিংস্র নেকড়েদের কাছ থেকে।

সতীত্ব ও পবিত্রতার শত্রুদের কাছ থেকে।

তাদের কাছ থেকেও যারা নারীর দিকে তাকায়–

লোভাতুর ও কামাতুর দৃষ্টিতে,

ভিতর যাদের আঁধারঘেরা, দুর্গন্ধময়।

নারী ইসলামের এই পর্দাকে যতো বেশি আকড়ে থাকবে ততো উচ্চতায় তার স্থান হবে। সেই উচ্চতায় বসে বসে নারী সুবাস ছড়াবে সুকুমারবৃত্তির, অনাবিলতার, স্বর্গীয় জ্যোতিধারার। সেখানে কোনোদিন পৌছতে পারবে না কোনো পঙ্কিল হাতের অসুন্দর স্পর্শ। কোনো বিশ্বাসঘাতকের অসংযত পা।

পর্দা নারীকে প্রিয় করে তোলে মানুষের কাছে। স্রষ্টার কাছে। পর্দার ভিতরে নারী থাকে চির সুরক্ষিত। চির পবিত্র। 'কাআন্নাহা লু'লু'উন মাকনূনাহ'। যেনো সে সুরক্ষিত মোতি! এমন নারীকেই পেতে চায় জীবন সফরের সঙ্গিনী হিসেবে আল্লাহভীরু পুণ্যবানরা। এমন নারীকেই ভয় পায় পাপাচারী দুর্বৃত্তরা।

তারা স্পষ্ট ভাষায় তখন জবাব দিয়েছিলো–

'না! তাদের দিকে তাকাতে আমাদের বুক কাঁপে। ওদেরকে দেখলেই মনে হয়– ওরাই বুঝি আমার মা, আমার বোন, আমার একান্ত আপনজন! তাই দৃষ্টি আমাদের নত হয়ে আসে।'

মানবতার নেকড়ে যারা, হাসতে হাসতে যারা লুটে নেয় নারীর ইজ্জত-সম্মান, তারাও পর্দানশীলা নারীকে শুধু ভয়ই পায় না– সম্মানও করে। তাদের কল্যাণ কামনা করে। তাদেরকে নিজেদের মা ভাবতে, বোন ভাবতে অনুপ্রাণিত হয়। সুতরাং পর্দাই সম্মান। পর্দাই গৌরব। পর্দাই নারীর অহঙ্কার। পর্দাকে গ্রহণ করে কোনোদিন নারী অসম্মানিত হয় নি। লাঞ্ছিত হয় নি। বঞ্চিতও হয় নি। বরং পর্দা নারীকে সম্মান দিয়েছে। মহিমান্বিত করেছে। তাকে পদে পদে হেফাযত করেছে। এই পর্দানশীলা নারী যখন প্রয়োজনের খাতিরে বাইরে যায়, তাকে সারাক্ষণ নিরাপত্তা দেয় তার স্বামী, তার ছেলে, তার একান্ত আত্মীয়রা। পথে-ঘাটে কেউ তাদেরকে উত্যক্ত করার সাহস পায় না। অপহৃতা হয়ে যারা সতীত্ব হারায়, স্বর্ণালঙ্কার পরে যারা ছিনতাইয়ের কবলে পড়ে, তাদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে কি– পর্দানশীলা কোনো নারী? অথচ কী নিঃশঙ্ক মনে পর্দানশীলা নারীরা হেঁটে বেড়ায় তাদের মাহরাম বা নিকটাত্মীয় পুরুষদের সাথে! অপরদিকে এই মাহরামরাও তাদেরকে নিয়ে চলাফেরা করে কতো গর্বভরে!! অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার রমরমা বাজারে এই এরা যেনো যুগের আয়েশা-খাদিজা!! এমন হবেই তো! পর্দা যে সতীত্বের প্রতীক! পর্দা যে নারীর আত্ম-পরিচয় খুঁজে পাওয়ার প্রতীক!!

প্রিয় বোন!

পর্দার ভিতরেই লুকিয়ে আছে অকল্পনীয় সৌভাগ্য ও শান্তি। অকল্পনীয় সুখ ও তৃপ্তি। আর বে-পর্দা? তা হলো আল্লাহ্র হুকুমের অবাধ্য হওয়া। সম্মান ও মর্যাদা থেকে এবং সতীত্বের ঐশী 'গ্যারান্টি' থেকে ছিটকে পড়া। নিজেকে মানবরূপী নেকড়েদের মুখে তুলে দেওয়া। মানবরূপী নেকড়েদের সামনে নিজের রূপ-লাবন্য তুলে ধরা। কিন্তু বোন আমার! কে খায় খোলা মিষ্টি– পোকা-মাকড় আর কীট-পতঙ্গ ছাড়া? ভদ্র ও সজ্জনরা ঐ মিষ্টির দিকে মুখ তুলেও তাকায় না। তাদের ভালোই জানা আছে এই মিষ্টি নষ্ট, এই মিষ্টি খাবারের অনুপযুক্ত। তাই তা খোলা, পরিত্যক্ত।

মহিলারাও ঠিক ঐ মিষ্টির মতোই। যদি তারা পর্দাবৃত থাকেন, নিজেদেরকে পর পুরুষের কাম-দৃষ্টি থেকে হেফাযত করে রাখেন, তাহলে যারাই এ অবস্থায় তাদেরকে দেখবে আকৃষ্ট হবে। অপরদিকে তারা যদি বেপর্দায় থাকে, খোলামেলা পোষাকে চলাফেরা করে, তাহলে সবাই তাদেরকে মন থেকে ঘৃণা করবে। তাদের দিকে ধাবিত হবে কেবল মানবতার নিকৃষ্ট কীটরাই । তারপর কী ঘটবে? তারপর ঘটবে সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা। সতীত্ব হারানোর বেদনায় তখন নীল হয়ে যাবে মানবতার সারা দেহ! নারীত্বের এই মহা সম্মানের ভূ-লুণ্ঠনে আকাশ থেকে তখন খসে খসে পড়বে বেদনাগ্রস্ত তারকারা! অমানুষের পায়ের নিচে পিষ্ট হবে সতীত্বের সম্মান ও নারীত্বের কোমলতা! এই অবস্থা দৃষ্টে আল্লাহভীরু বান্দারা চোখের পানি ফেলবেন আর আফসোস করে করে বিনিদ্র রাত কাটাবেন। আল্লাহ্‌র আরশ কাঁপানো মুনাজাতের ভাষায় বলবেন–

'হে আল্লাহ! আজ এ কী দেখতে হলো আমাদের? এ-সব দেখার চেয়ে যে মরে যাওয়াই ঢের ভালো ছিলো! হে আমার মাতৃজাতি! কবে হবে তোমাদের সুমতি?'

বোন আমার!

তুমি নিজের জন্যে এমন অবস্থা কি কল্পনা করতে পারো? এক মুহূর্তের জন্যেও কি ভাবতে পারো নিজের অসম্মান ও যিল্লতি? অসম্ভব!

সুতরাং তোমার সামনে দু'টি পথ। যে কোনো একটি পথ তুমি গ্রহণ করতে পারো। পর্দার পথ গ্রহণ করলে লাভ করবে দুনিয়া-আখেরাতে নাজাত ও মুক্তি। পর্দার পথ গ্রহণ করলে শুধু আখেরাতেই তোমার নাজাত ও মুক্তি নিশ্চিত হবে না বরং এই দুনিয়াতে বসেও তুমি লাভ করবে সম্মান ও ইজ্জতের জিন্দেগী। আর বে-পর্দার পথ বেছে নিলে তোমার অসম্মান ও লাঞ্ছনা কেউ ঠেকাতে পারবে না। জাহান্নামের আগুন থেকে কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।

প্রিয় বোন! আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوراً رَحِيماً

> 'হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, আপনার মেয়েদেরকে এবং মু'মিনদের স্ত্রীদেরকে বলে দিন তারা যেনো নিজেদেরকে 'জিলবাব' দিয়ে ঢেকে বের হয়, তাহলে সহজেই তাদেরকে চেনা যাবে এবং তাদেরকে উত্যক্তও করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু।'

বোন আমার!

লক্ষ্য করো! আল্লাহ শুরু করেছেন প্রথমে তাঁর রাসূলের স্ত্রী ও মেয়েদের দিয়ে! শুরু করেছেন পৃথিবীর সবচে' সতী ও পবিত্র এবং পুণ্যবতী ও মহিয়সী নারীদের দিয়ে! আল্লাহ তাঁদেরকেও পর্দার নির্দেশ দিচ্ছেন। নিষেধ করছেন বেপর্দা চলাফেরা করতে। জান্নাতনেত্রীদেরকে যদি আল্লাহ পর্দার জন্যে কঠোর হুকুম দিতে পারেন –চরিত্র যাঁদের শিশির-শুভ্র! হৃদয় যাঁদের পূত-পবিত্র– তাহলে আমাদের বর্তমান যুগের নারীদের বেলায় কী কল্পনা করা যায়?

বলো তো, ফেতনা-ফাসাদ ও বেহায়াপনার এই যুগে,

প্রবৃত্তির জয়জয়কারের এই যুগে,

সুকুমারবৃত্তিকে গলা টিপে হত্যা করার এই যুগে,

তোমাদের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত!

যে যুগে দল বেঁধে বেঁধে বখাটে তরুণরা–

'গার্লফ্রেন্ড' খুঁজে ফিরে এখানে ওখানে সবখানে?!

এমন কি অধিকাংশ শিক্ষায়তনের সবুজ (?) ক্যাম্পাসে?!

যে যুগে অবৈধ প্রেমিকার সাথে 'ডেটিং' করার জন্যে,

তাকে এক নজর দেখার জন্যে,

তার লাস্যময়ী অঙ্গভঙ্গি ও উচ্ছল হাসির কলকল শব্দ শোনার জন্যে– ব্যাকুল হয়ে ছুটে যায় চরিত্রহীন উন্মত্ত প্রেমিকরা?!

স্বীকার করি, বর্তমানে শরয়ী পর্দা মেনে চলা বড়ো কঠিন। কিন্তু বোন আমার! এক নারী হিসেবে তোমার দায়িত্ব অনেক বেশি। এ দায়িত্ব পালনে

মাত্র অবহেলা যদি তুমি করো তাহলে আল্লাহ্র সামনে কোন্ মুখে তুমি হাজির হবে? সুতরাং এ দায়িত্ব পালনে তোমাকে এগিয়ে আসতেই হবে। তোমাকে কেন্দ্র করেই যে এই উম্মতের ভিতরে ফেতনা ও স্খলন সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি! আল্লাহ্র নবী বলে গেছেন–

ما تركت بعدي فتنة أشدّ على الرجال من النساء .

'আমার পরে পুরুষের জন্যে সবচেয়ে কঠিন ফেতনা হলো– নারী।'

কুশিক্ষা,* সহশিক্ষা, অপসংস্কৃতি, স্যাটেলাইট আগ্রাসন ও মুসলিম শাসকদের দায়িত্বহীনতার কারণে যুব সম্প্রদায় এখন ধাবিত হচ্ছে অবৈধ প্রণয় ও প্রেম-খেলার দিকে। ধর্মহীন সাহিত্য-সংস্কৃতির দিকে। মন-মানস এখন তাদের ভীষণ অসুস্থ। সবখানে তারা কেবল খুঁজে ফিরে নারী-সংস্রব। শিক্ষায়তনে, কর্মস্থলে, প্রশিক্ষণ শিবিরে। সবখানে। নারী পাশে না থাকলে তাদের ভালো লাগে না। কাজে মন বসে না। পণ্য ছড়ায় না। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার জন্যে এ হলো এক মহা অশনি সংকেত। এ অবস্থা থেকে সমাজ মুক্তি না পেলে অধঃপতনের ধস কেউ ঠেকাতে পারবে না।

বোন আমার!

এই অবস্থায় তুমি যদি সচেতন না হও, তুমি যদি পর্দার হুকুম না মানো তাহলে পরিণতি বড়ো ভয়াবহ। তুমি কোনোক্রমেই যৌন-উন্মাদ এই মানব-নেকড়েদের থাবা থেকে বাঁচতে পারবে না। যে কোনো মুহূর্তে লুণ্ঠিত হতে পারে তোমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ– সতীত্ব। এরপর? হয়ত কোনোদিন আল্লাহ্র তাওফীক থাকলে তোমার ইজ্জত হরণকারী ঐ নেকড়ে তাওবা করে আবার সু-সমাজে ফিরে আসবে। অনুতাপ দগ্ধ হয়ে ক্ষমা লাভ করবে। কিন্তু এক নারী হিসাবে তুমি সমাজকে কী করে আর মুখ দেখাবে? তওবার পানি দিয়ে শত বার গোসল করলেও তো তোমার সতীত্বের মহিমা আর ফিরে আসবে না?!

বোন আমার!

আশা করি আমার কথা তুমি বুঝতে পেরেছো। সুতরাং সময় শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই তুমি সাবধান হও। যখন অনুতাপ ও কান্না কোনো কাজে আসবে না এবং দুঃখবোধ ও অশ্রুবিসর্জনও কোনো কাজে আসবে না।

***   ***   ***

বর্তমানে মাতৃজাতির অধপতন সম্পর্কে যারা জানেন,

দুঃখে তাদের হৃদয় জ্বলে যায়,

লজ্জায় তাদের মাথা নুয়ে আসে,

যন্ত্রণায় তাদের বিবেক দগ্ধ হয়। হৃদয়ে ঈমানের আলো থাকলে সে হৃদয় মাতৃজাতির এমন করুণ পরিণতিতে বেদনা-ভারাক্রান্ত হবেই। সে বেদনা অশ্রু হয়ে গড়িয়ে পড়বেই। এ অবস্থায় মুসলিম উম্মাহর কোনো বিবেকবান সদস্য হাসতে পারে না। উল্লাস করতে পারে না। উৎসবে মেতে উঠতে পারে না। চোখভরে ঘুমোতেও পারে না। হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতে পারে না। মুসলিম উম্মাহর চিহ্নিত দুশমন ইহুদী-খৃষ্টানদের ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত সম্পর্কেও বেখবর থাকতে পারে না।

বোন আমার!

লক্ষ্য করো এক ইহুদী কী বলে–

> نحن اليهود لسنا إلا سادة العالم ومفسديه .. ومحركي الفتن وجلاديه .
>
> 'আমরা ইহুদী। বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে বসে বিশ্ববাসীকে নষ্ট পথের দিকে ঠেলে দেওয়া, তাদের ভিতরে ফেতনা-ফাসাদ উস্কে দেওয়া এবং সুযোগ মতো ধরে ধরে তাদের কল্লা কাটা আমাদের অন্যতম মিশন।'

বিশ্বাস করো বোন!

নারীকে পণ্য বানিয়ে মুসলিম উম্মাহর নৈতিকতা ও সুকুমারবৃত্তির বিশাল প্রাসাদকে ভেঙে গুড়িয়ে দেয়া এই ইহুদীদের অন্যতম একটি বাণিজ্য। কিন্তু ইসলাম নারীকে দিয়েছে তার বিরুদ্ধে চাপিয়ে দেয়া সকল ষড়যন্ত্রের সামনে রুখে দাঁড়ানোর জন্যে এবং নিজেকে দুর্ভেদ্য প্রাচীরে সংরক্ষিত করে রাখার জন্যে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা। এই নির্দেশনা মেনে চললে অবশ্যই মিলবে সতীত্বের ঐশী 'গ্যারান্টি'। সভ্য ও সুশীল (আল্লাহওয়ালা)

সমাজে সৃষ্টি হবে তার সম্মানজনক সুদৃঢ় অবস্থান। তার হাতে জন্ম নেবে আদর্শ প্রজন্ম।

মনে রাখতে হবে, পর্দা ও সৌন্দর্য প্রকাশের ক্ষেত্রে নারীর উপর ইসলাম বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে তা সর্বতভাবেই নারীকে পুরুষের চরিত্র হনন ও নৈতিকতা ধ্বংসের হাতিয়ার ও মাধ্যম হওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে। তাকে অপমান ও লাঞ্ছনার হাত থেকে এবং অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগের পরিধি থেকে বাঁচানোর জন্যে। এ মোটেই নয় তার স্বাধীনতায় কোনো হস্তক্ষেপ। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إن الله حيِيٌّ ستِّير يحب الحياء والستر "....

'আল্লাহ লজ্জাশীল ও আচ্ছাদনকারী, ভালোবাসেন লজ্জা ও আচ্ছাদনকে ....।'

সুতরাং হে আমার প্রিয় বোন!

ভুলে যাবে না যে দুশমনের যুদ্ধ তোমাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে। এ যুদ্ধের লক্ষ্য ও টার্গেট– তুমিই। এবং তুমিই। পাশ্চাত্যের দুশমনরা লম্বা লম্বা সেমিনার ও সেম্পোজিয়াম করে আকর্ষণীয় ও চোখ ধাঁধানো মডেলদের বাছাই করে। তারপর তাদেরকে মিডিয়া ও 'ফ্যাশন-শো'গুলোতে পশু পালের ন্যায় ছেড়ে দেয়।

এই সব মডেল প্রদর্শনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী– জানো?

ইসলামের সেই মহান পর্দার বিধান থেকে তোমার দৃষ্টিকে সরিয়ে দেয়া,

যে পর্দা তোমার আব্রুকে ঢেকে রাখে,

কাম-কাতর দৃষ্টি থেকে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখে,

তোমাকে সতীত্ব ও পরিচ্ছন্নতার এক সুন্দর পৃথিবীর সন্ধান বলে দেয়।

তারা তোমার মাথা থেকে ক্রমান্বয়ে পর্দাকে হটানোর জন্যে এ জঘন্য পন্থা বেছে নিয়েছে– শিল্পের নামে, সংস্কৃতির নামে, নারী স্বাধীনতার নামে। তোমাকে পরাজিত করতে, তোমাকে তোমার কর্মস্থল– ঘর থেকে অনাবৃত করে, পর্দাহীন করে বের করে আনতে। তারা চায়– জিলবাব খুলে ফেলার

আগে তুমি যেনো লজ্জাকে ছুঁড়ে ফেলে দাও। লজ্জা না থাকলে একদিন জিলবাব তুমি ত্যাগ করবেই। তাই তারা আগে টার্গেট করে তোমার জিলবাবকে নয়– তোমার লজ্জাকে।

দুশমনরা মুসলিম নারীদেরকে বে-পর্দা করতে এমন কৌশলেই সামনে বাড়ে। অথচ আমরা তা বুঝি না। তোমাকে জিলবাবমুক্ত করার জন্যে, তোমাকে বোরকামুক্ত করার জন্যে দুশমনরা নিত্য নতুন ডিজাইন ও 'ফ্যাশন'-এ বাজার সয়লাব করে দিচ্ছে। সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে ব্যাপকভাবে এর পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছে। নির্লজ্জ মডেলদের গায়ে তা পরিয়ে পরিয়ে চোখ ধাঁধানো 'ফ্যাশন-শো'র জমকালো অনুষ্ঠান আয়োজন করছে। এ সবই করা হচ্ছে প্রধানত পর্দাপ্রথা থেকে মুসলিম মা-বোনদের সহজাত আকর্ষণ ও ভালোবাসাকে দুর্বল করে দিয়ে তাদেরকে ক্রমে ক্রমে পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্যে! বিস্ময়কর নয় শুধু, বেদনাদায়ক ব্যাপার হলো দুশমনরা এ কাজের জন্যে নিজেরা মাঠে নামার পাশাপাশি বর্তমানে কিছু নারীবাদী (মুসলিমনামধারী) মহিলাকেও তাদের এই মিশনে নামিয়ে দিয়েছে। এতে মুসলিম মা-বোনেরা আরো বেশী বিভ্রান্ত হচ্ছে।

হে নারী!

পর্দাকে ত্যাগ করে কোথায় ছুটে চলেছো তুমি?

জানো না! এই অবগুণ্ঠনে তোমাকে কতো সুন্দর লাগে?

কী দারুণ মানায়?

জান্নাতেও নারী এই অবগুণ্ঠনে সজ্জিত হয়েই তার স্বামী'র কাছে নিজেকে নিবেদন করবে। হাদীসে এসেছে–

ولنصيفها (خمارها) على رأسها خير من الدنيا وما فيها"

'নারীর মাথায় তার অবগুণ্ঠন দুনিয়া থেকে এবং দুনিয়ার ভিতরের সবকিছু থেকে উত্তম।'

ইমাম আহমদ রহ. এর বর্ণনায় এসেছে–

" ولنصيف امرأة من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها "

'জান্নাতি নারীদের অবগুণ্ঠন দুনিয়া থেকে এবং দুনিয়ার মতো আরেক দুনিয়া থেকে উত্তম।'

বাযার এবং ইবন আবি দুনিয়া (আবু বকর আবদুল্লাহ- বিশিষ্ট বাগদাদী মুহাদ্দিস) এর বর্ণনায় এসেছে-

"... ولو أخرجت الحورية نصيفها لكانت الشمس عند حُسنه مثل الفتيلة في الشمس لا ضوء لها ... ".

'জান্নাতি হুরের অবগুণ্ঠন যদি দুনিয়াতে প্রকাশ পেতো তাহলে তার ঝলক ও সৌন্দর্যের সামনে সূর্যের আলো এমন নিষ্প্রভ হয়ে যেতো যেমন নিষ্প্রভ হয়ে যায় সূর্যের আলোতে প্রদীপ।'

অবগুণ্ঠনের রূপ-সুষমাই যদি হয় এমন তাহলে এই অবগুণ্ঠন পরবে যে হুর ও জান্নাতি নারী, তার রূপ-সুষমা কতো বেশি হবে! কল্পনা করা যায় কি?

ইবনুল কায়্যিম রহ. এর ভাষায়:

ونصيف إحداهن وهو خمارها لیـــست له الدنيا من الأثمانِ

'তাদের একেকজনের অবগুণ্ঠন কেমন হবে জানো? দুনিয়ার বিচারে তা অমূল্য।

তবু কেনো পর্দাকে তুমি 'হ্যাঁ' বলবে না?

বোন আমার!

কে বলেছে তোমাকে-

তোমার চেহারা খুলে রাখা জায়েয? কে? কে?

আনন্দ বেদনার অনুভূতি কোথায় প্রকাশ পায়?

চোখের আবেদনময়ী ভাষা,

তার চিত্তহারী আকর্ষণ কোথায় লুকিয়ে থাকে?

কোথায় ফুটে উঠে পছন্দ-অপছন্দের অভিব্যক্তি?

কোথায় ফুটে উঠে রূপ-লাবন্যের আলোকিত পংক্তিমালা?

ভালোবাসা ও ঘৃণার শব্দমালা?

শুধু শুধু এবং শুধু এই চেহারায়ই নয় কি?

শুধু শুধু এবং শুধু এই চোখেই নয় কি?

তুমি কি আমার সাথে একমত হবে না?

মনে করো; তোমার সামনে আমি সাতজন মহিলার চেহারা নয়- শুধু তাদের হাতের ছবি দিয়ে বললাম- 'হাত দেখে বলে দাও তো, এদের ভিতরে কে সবচে' সুন্দর?'

তখন তুমি কি দু' চোখ বিস্ফারিত করে বলবে না যে, 'কক্ষনো আমি ফায়সালা দিতে পারবো না! শুধু হাত দেখে কী করে আমি ফায়সালা দিতে পারি? অনেক অসুন্দর মেয়ের হাতও সুন্দর হয়ে থাকে!! সুতরাং শুধু হাত দেখে সুন্দরতম মহিলাকে খুঁজে বের করা অন্যায় নয় শুধু–অসম্ভব ও অযৌক্তিকও।'

তোমার সাথে আমিও একমত। কিন্তু তোমার সামনে যদি তুলে ধরি সাতজন মহিলার চেহারার ছবি তাহলে তুমি কি অনায়াসেই বলে দিতে পারবে না তাদের মধ্যে কে সবচে' সুন্দর? নিশ্চয়ই পারবে! তাদের হাত-পা দেখার কি কোনো প্রয়োজন হবে? মোটেই না!

তাহলে কী প্রমাণিত হলো?

চেহারা খুলে রাখার কি কোনো অবকাশ আছে?

চেহারা খোলা রাখলে কি পর্দার উদ্দেশ্য অর্জিত হবে?

সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, চেহারা নারী-সৌন্দর্যের মূল আকর্ষণ ও কেন্দ্রস্থল হওয়ার কারণে তা ফেতনা ও দুর্ঘটনারও সবচেয়ে বড় কারণ। আর ফেতনা ও দুর্ঘটনার বড় কারণ হওয়ার কারণেই তা ঢেকে রাখতে হবে।

সুতরাং বোন আমার!

সতর্ক হয়ে যাও। এখন থেকেই সতর্ক হয়ে যাও।

একটু আয়নার সামনে দাঁড়াও তো! গভীর চোখে লক্ষ্য করো তোমার চেহারার নাজুকতা ও রূপময়তা। এবার বলো তো, তুমি কি চাও জাহান্নামের আগুনে এই চেহারা এবং এই ত্বক ও গোশত ঝলসে যাক! হাড্ডি ছাড়া সবকিছু পুড়ে ছারখার হয়ে যাক? না চাইলে এই দুনিয়াতেই তোমাকে সতর্ক হতে হবে। পর পুরুষের কাম-কাতর দৃষ্টি থেকে তা হেফাজত করতে হবে। হ্যাঁ, জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে চাইলে তা করতেই হবে।

বলো তো, সকল সৌন্দর্যের আধার যদি তোমার এই চেহারায় না থাকে, এই চোখে না থাকে তাহলে আছে কোথায়? তাহলে তা কেনো ঢেকে রাখবে না? কেনো পর পুরুষের সামনে তা খোলা রেখে ফেতনার দরোজাটাও খুলে দেবে? মনে রাখবে; ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করাতেই আমাদের সম্মান। পর্দাকে মন থেকে মেনে নেওয়াতেই আমাদের সম্মান।

কবিতার ভাষায়–

زعموا السفور و الاختلاط وسيلة ***

للمجـــد قوم في الخانة أغرقوا

كذبوا متى كان التعرض للخـــنا ***

شيئاً تعز به الشعوب وتسبقُ

'আশ্চর্য! কেমন করে এরা ভেবে বসলো পর্দাহীনতা ও নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার সিঁড়ি বেয়ে স্পর্শ করবে– সম্মান ও মর্যাদাকে! আসলে ওরা অশ্লীলতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত।

অশ্লীলতাকে ভাবে যারা সম্মান ও অগ্রগতির সিঁড়ি তারা মিথ্যা মরীচিকার পেছনেই কেবল ছুটে বেড়াচ্ছে।'

হে আল্লাহ! আমাদেরকে পর্দাহীনতার অভিশাপ থেকে রক্ষা করো। বাঁচাও পাশ্চাত্য সভ্যতার বিধ্বংসী ছোবল থেকে।

ইরশাদ হচ্ছে :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

"ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেনো নিজেদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেনো যা সাধারণত প্রকাশমান তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে এবং তারা যেনো তাদের মাথার ওড়না তাদের বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেনো তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাইপো, ভগ্নিপুত্র, বাঁদী, যৌন কামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো সামনে তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। তারা যেনো তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্যে জোর পদক্ষেপে না হাঁটে। হে মু'মিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তাওবা করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।'

নারীর পোষাকে যদি আকর্ষণীয় কাজ ও রঙ থাকে এবং তা যদি ছিদ্র-ছিদ্র হয় তাহলে মাহরাম ছাড়া নারীর এ-পোষাক অন্য কেউ দেখতে পারবে না। বরং এ ধরনের পোষাক পরে বের হলে অবশ্যই মহিলাদেরকে তা অন্য কোনো কাপড় দ্বারা ঢেকে বের হতে হবে।

হে নারী!

হে বোন!

হে রানী!

আল্লাহর বিধান মেনে চলতে দৃঢ় প্রতীজ্ঞায় আবদ্ধ হও। আর কালক্ষেপণ করো না।

এক কবি তোমাকে লক্ষ্য করে কী বলছে দেখো–

أختاه يا بنت الخليج تحشمي ***

لا ترفعي عنكِ الخمار فتندمي

هذا الخمار يزيد وجهك هيبةً ***

و حلاوة العينين أن تتحجبي

صوني جمالكِ إن أردتِ كرامةً ***

كي لا يصون عليكِ أدنى ضيغمِ

لا تعرضي عن هدي ربكِ ساعةً ***

عضي عليه مدى الحياة لتغنمي

'বোন আমার! হে উপসাগরীয় ললনা! লজ্জার ভূষণে ভূষিত হও, কোনো অবস্থাতেই পর্দা ত্যাগ করো না। করলে তোমার অনুশোচনার কোনো শেষ থাকবে না।

এই অবগুন্ঠন যে তোমার সৌন্দর্য-সুষমা ও রূপ-লাবন্য আরো বাড়িয়ে দেয়– তা কি জানো? পর্দার আবরণে তোমার দৃষ্টিকে কতো মায়াময়-মধুময় মনে হয়– তা কি বোঝো?

সম্মান যদি তোমার কাম্য হয় তবে তোমার রূপের হেফাযত করো। কোনোদিন কোনো অশুভ শক্তি যেনো তোমাকে আক্রমণ করতে না পারে।

মুহূর্তের জন্যেও তোমার রব-এর দেখানো পথ থেকে

বিচ্যুত হবে না। হিদায়াতের পথকে জীবনভর আকড়ে থাকার শর্তে ভোগ করে যাও দুনিয়ার তাবৎ নেয়ামত।'

হ্যাঁ .. আল্লাহকে ভুলে গেলে আল্লাহও তোমাকে ভুলে যাবেন। ইরশাদ হচ্ছে:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى.

'যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার জীবিকা সংকীর্ণ হয়ে যাবে এবং আমি কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় তাকে উপস্থিত করবো। সে বলবে– 'হে আমার রব! আমাকে কেনো অন্ধ অবস্থায় উঠালেন? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম!' আল্লাহ বলবেন– তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ আসার পর তুমি যেমন তা ভুলে গিয়েছিলে আজ তেমনি তোমাকেও ভুলে যাওয়া হবে।'

আল্লাহু আকবার!

প্রিয় বোন!

একটু কি ভেবেছো সেই কঠিন দিনে কী অবস্থা হবে তোমার, যদি আল্লাহ ভুলে যান তোমাকে? তাঁর রহমত ও অনুগ্রহ ছাড়া তোমার নাজাত ও মুক্তির কোনো উপায় নেই!

তারপরও কেনো তুমি এতো উদাসীন,

এতো বেখবর,

এতো বেপরোয়া?

কেনো তুমি আখেরাতের স্বার্থকে পায়ে দলে দুনিয়ার স্বার্থের পেছনে ছুটে চলছো? লাভ-ক্ষতি কি তুমি একদম বোঝো না? তোমাকে আবার বলছি–

পর্দার বিধান দিয়ে আল্লাহ মোটেই তোমার প্রতি জুলুম করেন নি। বরং এই পর্দার ভিতরেই লুকিয়ে আছে তোমার ইজ্জত ও সম্মান-রহস্য। কবি বড়ো সুন্দর বলেছেন–

ما كان ربكِ جائراً في شرعه ***

فاستمسكي بعراه حتى تسلمي

ودعي هراء القائلين سفاهةً ***

إن التقدم في السفـــور الأعجمِ

إن الذين تبـــرأوا عن دينهم ***

فهـــمُ يبيعـــون العفاف بدرهمِ

حلل التبرج إن أردتِ رخيصةً ***

أما العفاف فدونه سفك الدمِ

لا تمنحي المستشرقين تبسماً ***

إلا ابتسامة كاشرٍ متجهِّمِ

أنا لا أريد بأن أراكِ جهولةً ***

إن الجهالة مرة كالعلقمِ

فتعلمي وتثقفي و تنوري ***

والحق يا أختاه أن تتعلمي

لكنني أمسي وأصبح قائلاً ***

أختاه يا بنت الخليج تحشمي

'তোমার প্রতি তোমার রব অবিচার করবেন শরীয়তের এই বিধান দিয়ে– এটা যে অকল্পনীয়! ফিরে এসো। আকড়ে ধরো তাঁর বিধানকে। সঁপে দাও নিজেকে তাঁর কাছে।'

> 'সেই নির্বোধদের বাজে কথায় কান দিও না বোন! যারা বলে অগ্রগতি নিহিত পর্দা থেকে বেরিয়ে আসার ভিতরে।'
>
> 'যারা দ্বীনকে প্রত্যাখ্যান করেছে তারাই কেবল পারে সামান্য অর্থের লোভে নিজেদের সতীত্ব বিকিয়ে দিতে!'
>
> 'এই সামান্য অর্থের লোভ যদি সামলাতে না পারো তাহলে পরে নাও হে বোকা মেয়ে– পর্দাহীনতার 'অলঙ্কার'। কিন্তু মনে রাখবে! সতীত্বের পথে না হেঁটে আর যে পথেই তুমি হাঁটো না কেনো তোমার সতীত্বের রক্তে ভেসে যাবেই তোমার দামান!!!'

'শোনো! প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের মুখে বিজয়ের হাসি ফুটতে দিও না! পারলে ব্যর্থতার বিকৃত হাসিতে ওদের মুখ অন্ধকার করে দাও!!'

'আমি তোমাকে মূর্খতার ভূমিকায় দেখতে চাই না। জানো না! মূর্খতা সে যে হানজাল নামের তিতা ফল!'

'তাই শেখো, জীবনকে সভ্যতার অপরূপ রূপে সাজাও। আলোকিত করো। সত্য কী– তা তোমাকে জানতেই হবে, শিখতেই হবে।'

'হে সাগর পাড়ের ললনা! শুনতে পাও না? সকাল-সন্ধ্যা আমি যে কেবল বলেই চলেছি– 'পর্দার ভূষণে ভূষিত হও!!'

মনে রাখবে! জিলবাবশূন্য হয়, পর্দা ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং খোলামেলা ও অশালীন পোষাকে ঘুরে বেড়ায় তারাই, যারা নির্লজ্জ। তুমি কী করে তাদের মতো হতে পারো? ভুলে যেয়ো না! লজ্জা না থাকলে ঈমান থাকে না। লজ্জা না থাকলে মহিলাদের সব সৌন্দর্য মাটি হয়ে যায়। লজ্জা থাকলে, সতীত্ব থাকলে এবং উত্তম চরিত্র থাকলেই মহিলারা হয় প্রশংসিত ও আদর্শ।

আম্মাজান হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচে' বেশি লজ্জা করতেন কুমারী মেয়ের খাস কামরায় যেতে।

বেদনাদায়ক সত্য হলো বর্তমানে লজ্জা একেবারে উঠেই গেছে। অথবা

একেবারে কমে গেছে। লজ্জা কেনো হারালো তার মহিমা? এখন কোনো মেয়ে যদি বেশি লাজুক হয় তাহলে এটাকে মনে করা হয়– অসামাজিকতা।

তুমি চোখ লাল করে বলো–

অসামাজিকতা?

আল্লাহর হুকুম মানলে হয় অসামাজিকতা?

তাহলে আমি অসামাজিক হতে চাই।

আমার বোন!

লক্ষ্য করো কবিতার ভাষা–

صوني حياءك صوني العرض لا تهني ***

وصابري واصبري لله واحتسبي

إن الحيـــاء مــــن الإيمــــان فاتخذي ***

منه حليّك يـــا أختاه واحتجبي

و يـــا لـــقبح فتـــاة لا حيـــاء لها ***

و إن تحلّت بغالي الماس و الذهب

إن الحجاب الذي نبغيه مكرمـــة ***

لكــــل حواء ما عابت و لم تعب

نريد منهـــا احتشاماً عفةً أدبـــاً ***

وهــــم يريدون منها قلة الأدب !

'লজ্জা বাঁচাও। বাঁচাও তোমার সম্মান। হীনবল হয়ো না। সবাইকে ধৈর্যের দাওয়াত দাও। নিজেও ধৈর্য ধরো। বিনিময় যে আল্লাহ দেবেনই– এ বিশ্বাস কখনো হারাবে না।'

'লজ্জা ঈমানের অংশ। সুতরাং নিজেকে সাজাও লজ্জার অলঙ্কার দিয়ে। গর্ব করো পর্দা নিয়ে।'

'হায় কী কুৎসিত লাগে ঐ পর্দাহীন মেয়েটাকে! পরুক না যতোই সে মহামূল্যবান অলঙ্কারাদি!'

'আমরা যে পর্দা– হৃদয় দিয়ে কামনা করি তা অতি মহান এক জিনিস। যা হাওয়ার প্রতিটি মেয়ের জন্যেই তা সম্মান ও গৌরব বয়ে আনে। অসম্মান তার কাছেও আসতে পারে না।'

'হায়! ওদের অবিচার দেখে বড়ো কষ্ট লাগে। আমরা চাই নারী জাতির ভূষণ হোক লজ্জা, সতীত্ব ও উত্তম আখলাক। আর ওরা চায় তার উল্টোটা!'

বোন আমার!

বাধ্য হয়ে কখনো যদি তোমাকে বাইরে যেতে হয় বা দূরে কোথাও সফর করতে হয়, দেশের বাইরে যেতে হয়। কোনো অমুসলিম দেশে যেতে হয়। তবু তুমি পর্দা ত্যাগ করবে না। বিজাতি কি তোমার দেশে এসে তাদের নিজস্ব পোষাক ছেড়ে তোমার পর্দা গ্রহণ করে? তাহলে তুমি কেনো তাদের দেশে গিয়ে তাদের পোষাক-সংস্কৃতির শিকার হবে? তারা আমাদের দেশে এসে আমাদের পোষাক গ্রহণ না করলে আমরা কেনো তাদের দেশে গিয়ে তাদের পোষাক গ্রহণ করতে যাবো?

আল্লাহ্র হুকুম সব সময় পালনীয়। সব জায়গায়, সব দেশে পালনীয়। আল্লাহ্র হুকুমের সাথে স্থান-কাল-পাত্রের কোনো সম্পর্ক নেই। স্থান-কাল-পাত্র আল্লাহ্র হুকুমের অনুগত ও মুখাপেক্ষী, আল্লাহ্র হুকুম স্থান-কাল-পাত্রের অনুগত ও মুখাপেক্ষী নয়। কোরআনের ভাষায়–

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো কাজের আদেশ করলে কোনো ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর কোনো অবকাশ নেই তাঁর নির্দেশ অমান্য করার। যে আল্লাহ ও

তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।'

না বোন! হতাশার কোনো কারণ নেই। এতোদিন যদি তুমি না বুঝে, না জেনে পর্দা না করে থাকো, তাহলে হতাশার কিছুই নেই। মৃত্যু পর্যন্ত তাওবার দরোজা খোলা আছে। তাওবাকারীকে আল্লাহ ফিরিয়ে দেন না।

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

'বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছো তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।'

*** *** ***

শেষ করার আগে তোমাকে বলতে চাই ইসলামী হিজাবের শর্তগুলো কী কী–

- ইসলামী হিজাবের প্রথম শর্ত হলো, সমস্ত শরীর ঢাকা থাকতে হবে।
- বোরকা হবে ঢিলেঢালা। পাতলা হতে পারবে না। সৌরভমাখা হতে পারবে না।
- বোরকায় আকর্ষণীয় কোনো ডিজাইন ও কারুকাজ থাকতে পারবে না। পর-পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে– এমন ডিজাইন ও কারুকাজ বোরকায় বর্জন করে চলা ওয়াজিব।
- বোরকা কাঁধ থেকে হতে পারবে না। বরং মাথা থেকে হবে।

বোন আমার! সব শেষে বলতে চাই– তোমাকে সময় সময় সতর্ক থাকতে হবে।

وإن هوى بك إبليس لمعصية ***

فاهلكيه بالاستغفار ينتحب

بسجدة لك في الأسحار خاشعة ***

سجود معترف لله مقترب

وخير ما يغسل العاصي مدامعه ***

والدمع من تائب أنقى من السحب

'শয়তান যদি তোমাকে পাপের কাজে প্ররোচিত করে তাহলে ধ্বংস করে দাও শয়তানকে–

ইস্তেগফারের অস্ত্র দিয়ে।'

'প্রয়োজনে আশ্রয় নাও–

শেষ রাতের সেজদায়।

যে সেজদা তোমাকে আল্লাহ্‌র ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে নিয়ে যাবে।'

'পাপীকে ধুয়ে-মুছে একেবারে পরিষ্কার করে দেয় যা– সে তো তার চোখের উষ্ণ-অশ্রু! জানো না! তাওবাকারীর অশ্রু বৃষ্টির পানির চেয়েও স্বচ্ছ ও পরিষ্কার!!'[১]

সমাপ্ত

---

[১] 'হে নারী পর্দা তোমার অহংকার।' পরিশিষ্ট-অংশটি আরব জাহানের খ্যাতিমান লেখিকা উম্মে সুমাইয়ার একটি পুস্তিকার অনুবাদ। বিষয়বস্তুর চমৎকার সামঞ্জস্যের কারণে সংযোজিত হলো। -অনুবাদক